৭.১৫ বনহুর ও জলদস্যু – Bangla Library

৭.১৫ বনহুর ও জলদস্যু – Bangla Library

বনহুর ও জলদস্যু–১১৫

মনিরার দুচোখে বিস্ময়।

নূর কি পাগল হয়েছে! প ভরা শুকনো কাদা নিয়ে, সাধারণ এক লোকের পরিচ্ছদে হঠাৎ মাকে এসে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো–আম্মি কি আনন্দ,..কি আনন্দ… তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না আম্মি…..

সবাই তাকিয়ে রয়েছে অবাক চোখে, বলে উঠলো মনিরা–কি হয়েছে নূর? পা ভরা কাদা মাটি আর শরীরের একি চেহারা…

নূর মনিরাকে নিয়ে বসিয়ে দেয় একটা আসনে। তারপর সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগমকেও বসতে বলে নিজেও বসে পড়ে একটা বেতের মোড়ায়, বলে– আম্মি, আজ আমি গিয়েছিলাম সেখানে–সেই দুঃস্থ অসহায়, অনাথ মানুষগুলো যেখানে বাস করে সেই বস্তী এলাকায়। বনহুরকে যারা ফেরেস্তার মত ভালবাসে। বনহুরের দয়ায় যারা বেঁচে আছে। মরিয়ম বেগমের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে নূর–দাদু, কি যে আনন্দ পেয়েছি তাদের মধ্যে যখন বিলিয়ে দিচ্ছিলাম অর্থ আর কাপড়, তা ঠিক তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বললেন–এসব কি বলছিস তুই নূর?

সত্যি দাদু, যা কল্পনা করা যায় না। নূর এখন মরিয়ম বেগমকে দাদু বলে ডাকে। বড় আদরের ডাক তার।

সরকার সাহেবকে নূর সরকার দাদু বলে ডাকে, তাকেও সে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে। মায়ের মুখে শোনা সরকার দাদুর জীবনকাহিনী সে জানে। চিরদিন এ বাড়ির সেবা করে চলেছেন সরকার দাদু। এমন ভাল লোক আর হয় না।

নূর একবার সরকার সাহেবের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। ঐ মুখ খুশিতে দীপ্তিময়। তাদের মনির অসহায় গরিবদের কাছে মহান এক মানুষ।

মরিয়ম বেগমের ঘোলাটে চোখে আনন্দের আভা ফুটে উঠেছে।

মনিরার মুখমন্ডল শান্ত ধীর স্থির, কোনো ভাবের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না তার মধ্যে। পুত্রের মুখে স্বামীর নাম শুনে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো স্বামীর প্রতিচ্ছবি। একটা অভিমানে তার দুচোখে অশ্রু টলমল করে উঠলো।

নূর বলে যায় সমস্ত ঘটনাটা মা দাদীমা আর সরকার সাহেবের কাছে।

অবাক হয়ে শুনছিলেন সবাই। মনিরার মুখ এবার কঠিন হয়ে ওঠে।

গম্ভীর গলায় বলে–কে সেই নারী যার সঙ্গে ওর এত সংযোগ? যে তোকে এত অর্থ অনাথ মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য দিয়ে গেলো। বনহুরের দয়ায় যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জন্য তার এত দরদই বা কেন? একটু চুপ থেকে আপন মনে বলে ওঠে–তাহলে আমার অনুমান সত্য। ও আত্মগোপন করে এক নারীকে দিয়ে তার বাসনা চরিতার্থ করছে......

আম্মি, তুমি আব্বুকে ভুল বুঝো না।

তাহলে সে নারী কে? ওর সঙ্গে সে নারীর কিইবা সম্বন্ধ?

জানি না। আমার মনেও সে প্রশ্ন জেগেছিলো কিন্তু না না, আমি পারবো না আব্বুকে অবিশ্বাস করতে নূরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে, একটু থেমে মুখে হাসি টেনে বলে–তুমি যদি একবার তাদের মধ্যে যেতে তাহলে দেখতে কি আনন্দ, বনহুর নামে তারা আত্মহারা। আব্বুকে খুঁজে পেতে ঐ সব দীনহীন কাঙ্গালদের মধ্যে।

নূর

হাঁ আম্মি, আমি এতদিন জানতাম না, বুঝতে পারিনি আব্বু কেন নিজেকে এভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছেন......তার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না আম্মি। নূর কথাগুলো বলে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে।

মা আর ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছিলো। যতক্ষণ ওরা কথা বলছিলো নীরবে শুনছিলেন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব। তারা পুলকিত হচ্ছিলেন মনে মনে।

মনিরার মনে নতুন করে এই মুহূর্তে স্মরণ হয় স্বামীর কথা। সত্যি সে কতদিন হলো আসে না, জানে না কোথায় আছে, কেমন আছে তার মনির। মনিরার চিন্তাধারা চলে যায় অতীতের দিনগুলোতে। বনহুর আর মনিরা একই গাড়িতে বসে যাচ্ছিলো শহরের পথ বেয়ে। অদূরে কোনো এক বাড়ি থেকে ভেসে এসেছিলো আর্তনাদ, নারীকণ্ঠের করুণ চিৎকার। বনহুর কোনো মেয়ে বিপদে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, মনিরা ধরে ফেলেছিলো ওর হাত, না না, তোমাকে আমি যেতে দেব না বনহুর কোনো কথা তার শোনেনি, শুধু বলেছিলো তুমি গাড়িতে বসো আমি এখনি আসছি। কিন্তু যখন সে ফিরে এলো তখন তার শরীরে রক্তের দাগ ছিলো। তার চোখেমুখে একটা ভীষণ ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছিলো, চমকে উঠেছিলো মনিরা, ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেছিলো, তোমার জামাকাপড়ে রক্ত কেন বনহুর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বলেছিলো, একটা জানোয়ারকে হত্যা করে একটি ফুলকে উদ্ধার করেছি। বলেছিলো মনিরা, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। সে কথা পরে শুনো, বলেছিলো মনির, তারপর উল্কাবেগে গাড়ি নিয়ে সরে

এসেছিলো। তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিলো, মাকে দেখবার জন্য গাড়ি থেকে অবতরণ করেনি সেদিন সে।

মনিরাকে গভীরভাবে কিছু ভাবতে দেখে বলে নূর– আম্মি, একদিন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, দেখবে মানুষ আব্বুকে কত ভালবাসে।

পুত্রের কথা তখন মনিরার কানে প্রবেশ করে না। সে তখনও ভেবে চলেছে তার স্বামীর কথা–যে সন্তান একদিন পিতার আসল পরিচয় পেয়ে ঘৃণায় অবমাননায় মুষড়ে পড়েছিলো সেই সন্তান আজ পিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কি ভাবছো আম্মি?

আজ যার প্রশংসায় দিশেহারা একদিন তাকে তুই ঘৃণা আর অবমাননায় তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলি, মনে পড়ে সেদিনের কথা?

মনে পড়ে আজ, বারবার মনে পড়ে, আব্বুর আসল রূপ আমি সেদিন দেখিনি আর দেখিনি। বলেই তাকে চিনতে ভুল করেছিলাম।

নূর যখন কথাগুলো বলছিলো তখন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো।

*

এ কথা পুলিশমহল জানতে পারলো। কে সে ব্যক্তি যে বস্তি এলাকায় গিয়ে প্রচুর অর্থ–অস্ত্র দান করে আসে। যদিও এ ব্যাপার পুলিশমহলের দুশ্চিন্তার কারণ নয় তবুও সন্দেহ জাগে মনে–তবে কি বনহুর অথবা বনহুরের কোনো অনুচরের কাজ এটা? কৌশলে ধরতে হবে এই ব্যক্তিকে। তারই কাছে পাওয়া যাবে বনহুরের আস্তানার খোঁজ।

পুলিশমহলে এ ব্যাপার নিয়ে গোপনে শলাপরামর্শ চললো।

অবশ্য সংবাদটা দিয়েছিলো এলাকার কোনো এক দুষ্ট লোক। এ বস্তির বহু লোক এক কারখানায় কাজ করতো। কারখানার মালিক কিঞ্চিৎ পয়সার বিনিময়ে হাড়ভাংগা খাটুনি খাঁটিয়ে নিতো ওদেরকে। শুধু যে পয়সাই কম দিতো তাই না, নানা রকম অমানুষিক অত্যাচার করতে কারখানার মালিক এই সব বস্তির লোকদের। তবু তারা নীরবে কাজ করে যেতে, কারণ তারা শিক্ষাহীন,

অর্থশূন্য গরিব মানুষ। মালিকগণ যত অত্যাচার উৎপীড়ন করুক না কেন তবু কাজে যেতে হবে–পয়সা উপার্জন করতে হবে, না হলে পেট চলবে না।

মালিক জানতে পারলো কোনো এক ব্যক্তি বস্তি এলাকায় গিয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর অর্থ এবং পরিধেয় বস্ত্র দান করে গেছে। তখন মালিকের মনে ভীষণ একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো, ওদের মনে ভয় জেগেছিলো। কারণ বনহুর যখন এদের মধ্যে অর্থ বিলিয়ে দিতো তখন এরা নানা ধরনের বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করতো। কাজে অবহেলা দেখাতো, মালিকের অত্যাচার তারা বরদাস্ত করতো না। আবার সেই অবস্থার আশংকায় মালিক আতঙ্কিত হলেন তাই গিয়ে জানালো সংবাদটা পুলিশমহলে।

পুলিশমহল চিন্তিত হলো, নিশ্চয়ই পুনরায় দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছে। আর না হয় কোনো অনুচর এভাবে বস্তির মানুষগুলোকে সায়েস্তা করার জন্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

নূর এসব সংবাদ জানালো না।

সে পুনরায় আর একদিন কাপড় বিক্রেতার বেশে বস্তি এলাকায় গিয়ে হাজির হলো।

তাকে দেখামাত্র বস্তির সকল মানুষ, যুবক–যুবতী বৃদ্ধ–বৃদ্ধা ছেলেপিলে সবাই ঘিরে ধরলো। ঠিক যেমনটি করে ঘিরে ধরতে তারা বনহুরকে।

পুলিশমহল প্রস্তুত ছিলো, কারখানার মালিকের একজন লোক সংবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেললে তারা বস্তি এলাকা, তারপর একজন পুলিশ অফিসার নূরকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে যেতেই নুর মুখের দাড়িগোঁফ খুলে ফেললো।

একি আপনি! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন পুলিশ অফিসারটি।

নূর হেসে বললো–বস্তি এলাকার মানুষগুলো বড় সরল সহজ, তাই ওদের মধ্যে নিজেকে আমার ভাল লাগে আর সেই কারণেই আমার আসা।

পুলিশবাহিনী মনে করেছিলো তারা আজ এমন এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবে যে বনহুর স্বয়ং অথবা বনহুরের অনুচর। কিন্তু একি, এ যে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ

মিঃ নূর।

পুলিশমহল লজ্জিত হলো।

তারা ফিরে এলো বিমুখ হয়ে।

বস্তি এলাকার মানুষগুলোর মনেও বিস্ময়, তারা ভাবতেও পারেনি প্রখ্যাত ডিটেকটিভ তাদের মধ্যে মুক্ত হস্তে দান করছে।

ফিরে আসে নূর বাসায়।

পথে কোনো হোটেলে সে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে নেয়, তাই বাসার চাকরবাকর বাবুর্চি তারা কিছু বুঝতে পারে না।

*

বনহুর সেই কাঁচের শার্শীর পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো অনেক কথা–আস্তানার কথা, চৌধুরীবাড়ির কথা, কান্দাই–এর মানুষ যারা তার দয়ায় বেঁচে আছে তাদের কথা। বেশি করে মনে পড়ছে মায়ের কথা। মাকে কতদিন বনহুর দেখেনি। তারপর ভাবছে জাভেদের কথা। না জানি সে কোথায় চলে গেলো। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে। নূরীকে সান্ত্বনা দেবার কিছুই রইলো না……

কি ভাবছেন?

কে, ইলোরা, তুমি!

হাঁ, কি ভাবছেন বলুন তো?

আর কতদিন এ অবস্থায় কাটাবো বলোতো?

খিল খিল করে হেসে ওঠে ইলোরা।

বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ইলোরার মুখের দিকে।

ইলোরা বলে–আমি হাসছি বলে অবাক হচ্ছেন তাই না? তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে ইলোরা–শুধু আপনি নন, আপনার মত কত মানুষ

এখানে আছে, যারা শত চেষ্টা করেও হামবার্ডের হাত থেকে উদ্ধার পায়নি।

অবুঝের ভান করে বলে বনহুর–সত্যি, আমার মত আরও লোক আছে এখানে?

আছে।

কারা তারা?

আজ তারা পাকা দস্যু বনে গেছে।

ইলোরা!

বলুন?

তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি এখানে হঠাৎ এসেছে বা তোমার সঙ্গে এদের কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমাকে সভ্যজগতের মানুষ বলে মনে হয়।

আপনার চিন্তাধারা সত্য।

চলো বসে কথা বলি।

বনহুর আর ইলোরা এসে বসলো।

ইলোরা বনহুরের জন্য খাবার নিয়ে আসে। কোনোদিন বনহুর যদি বলে, আজ ক্ষুধা নেই তাহলে ইলোরা বড় মন খারাপ করে, বলে–আপনি না খেলে এখানে কেউ আপনার জন্য ভাববে না।

বলেছিলো বনহুর–কি দরকার আমাকে নিয়ে ভাবার। নাইবা কেউ ভাবলো তাতে আমার দুঃখ নেই।

কিন্তু আমি তো পারি না। আপনি কষ্ট পেলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগে।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে হেসেছিলো শুধু। সে হাসির অর্থ বোঝেনি ইলোরা। ওকে বড় ভাল লাগে, ইলোরা হামবার্ডের সহচরীদের মধ্যে শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী।

হামবার্ড জানতে দস্যু বনহুরকে বশে আনা কম কথা নয়। তাকে হাতের মুঠায় নিতে হলে কৌশলে কাজ করতে হবে। ইলোরাকে তাই সে বেছে নিয়েছিলো বনহুরকে বশে আনার টোপ হিসেবে।

হামবার্ড ইলোরাকে বলেছিলো–ইলোরা, তুমিই পারবে ওকে আয়ত্তে আনতে। তোমাকে আমি এমন বখশী দেবো যা তোমার জীবনকে ধন্য করবে। যাও যেভাবে পারো বনহুরকে তুমি আয়ত্তে আনন।

ইলোরা জানতো হামবার্ড একটা নর শয়তান। তার চোখের সামনে সে কতজনকে হত্যা করেছে। কতজনকে সাগরে ডুবিয়ে মেরেছে। কত নারীর ইজ্জত নষ্ট করেছে। যাত্রীবাহী জাহাজে হানা দিয়ে যাত্রীদের ধনসম্পদ লুটে নেয়, তার সঙ্গে লুটে নেয় যাত্রীদের সুন্দরী বধু–কন্যাদের। ধরে আনে ডুবুজাহাজে, যে জাহাজের সন্ধান কেউ জানে না। এমনকি বনহুরও হামবার্ডের সন্ধান জানতো না। মহাসাগরের গভীর অতলে আত্মগোপন করে হামবার্ড চালিয়ে চলেছে লুটতরাজ।

ডুবুজাহাজটার মধ্যে এমন কতকগুলো মেশিন সে তৈরি করে নিয়েছিলো যা সভ্যজগতের মানুষ আজও কল্পনা করতে পারে না। সাগরের তলদেশ থেকে ক্যাবিনে বসে সে টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পায় শত শত মাইল দূরে। কোন্ পথে জাহাজ আসছে, যাত্রীবাহী জাহাজ না মালবাহী সব সে মিটারে বুঝতে পারে। এমন কি কোন্ জাহাজে কি পরিমাণ মালামাল আছে তাও মিটারে ধরা পড়ে। অদ্ভুত সব মেশিন।

ইলোরা জানে সে যখন বনহুরের ক্যাবিনে আসে তখন হামবার্ড গিয়ে বসে তার সেই টেলিভিশন পর্দার সম্মুখে। কি কথা–বার্তা হচ্ছে শুনতে পায় সাউন্ডবক্সে। কাজেই ইলোরা যখন জানে হামবার্ড তাকে লক্ষ করছে টেলিভিশন পর্দায় তখন সে সংযতভাবে কথাবার্তা বলে।

বনহুর ব্যাপারটা প্রথম প্রথম জানতো না, তাই সে হামবার্ড সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করে বসতো, যার কোনো জবাব দিতো না ইলোরা, কারণ সে জানে তার এবং বনহুরের কথাবার্তা সব হামবার্ড শুনতে পাচ্ছে।

আজ ইলোরা জানে হামবার্ড মেতে আছে নেশায় তাই সে বনহুরের খাবার নিয়ে চলে এসেছিলো তার ক্যাবিনে। বনহুর যখন ইলোরাসহ এসে বসলো তখন

ইলোরাই বললো–হামবার্ড নেশা করছে।

বনহুর বুঝতে পারলো এ মুহূর্তে তাকে এবং ইলোরাকে হামবার্ড দেখছে না। অবশ্য কথাটা একদিনে। সেদিনও নেশা করছিলো হামবার্ড তার নিজ ক্যাবিনে।

বনহুর খাবারের রেকাবি থেকে কাটা–চামচ দিয়ে একটা মাংসের টুকরা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললো–হামবার্ড কোথায়?

নেশায় মাতোয়ারা। তাই তো এলাম সেই ফাঁকে।

আজকে তোমাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছে।

জানি না কেন আমি আসার পর থেকে আমার মন প্রফুল্লতায় ভরে গেছে। বড় এক নিঃসঙ্গ লাগতো, এখানে যারা আছে তাদের কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। যদিও অন্যান্য সবার মধ্যে আমাকে হামবার্ড বেশি বিশ্বাস করে.........

সে কারণেই বুঝি তোমাকে তার প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

হাঁ, সে কথা মিথ্যে নয়।

বনহুর পুনরায় আর একখন্ড মাংস মুখে ফেলে বললো–আমিও কি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

ইলোরার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো সে–বনহুর, একদিন তোমার নাম শুনে ভীত আতঙ্কিত হয়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার মন সচ্ছ কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমার দেবমূর্তি আমাকে অভিভূত করেছে... ... ...

ইলোরা এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়ে যে, সে বনহুরকে তুমি বলে সম্বোধন করে বসে।

বনহুর হাসে।

ইলোরা বলে চলে–আমি জানি তুমি একজন প্রখ্যাত দস্যু। সমস্ত পৃথিবী জোড়া তোমার সুনাম......

সুনাম নয় ইলোরা……

আমি বলবো–তোমাকে একশ্রেণী যেমন ভয় করে তেমনি অপর একশ্রেণী করে শ্রদ্ধা।

সে হয়তো তোমার ধারণা।

না, ধারণা নয় সত্য। হামবার্ডের মুখে শুনতাম একটিমাত্র লোকই আছে যে গভীর সাগরতল হতে সেই মাণিক উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হবে, সে হলো বনহুর। জানো বনহুর, দস্যুরাণীর হাতে যে মহামূল্যবান মাণিক তুমি তুলে দিয়েছে সে মাণিকের খোঁজ হামবার্ড আগে থেকেই জানতো আর সে কারণেই হামবার্ড সন্ধান চালিয়ে এসেছে এতদিন। তোমাকে পাকড়াও করার একমাত্র কারণ হামবার্ড বা তার অনুচরগণ যা পারে না তাই তোমার দ্বারা সাধন করবে সে।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলো।

ইলোরা বললো–সত্যি যখন জানতে পারলাম দস্যু বনহুরকে আমরা কৌশলে বন্দী করে এনেছি তখন আমার বিপুল এক বাসনা জাগলো তাকে দেখবার। তারপর যখন হামবার্ড বললো–বনহুরকে বশে আনার দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হলো ইলোরা, তখন আমি শিউরে উঠেছিলাম। তোমাকে দেখবার যে বিপুল ৰাসনা মনের কোণে লুকিয়ে ছিলো তা কপুরের মত উবে গেয়েছিলো।

বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?

হাঁ, সত্যি বলতে কি এমন ভয় পেয়েছিলাম যে কি বলবো।

হামবার্ডের চেয়েও আমি ভয়ংকর, তাই না?

আগে তাই মনে করেছিলাম।

আর এখন?

সত্যি তুমি এমন তা জানতাম না। হামবার্ড হিংস্র জন্তুর মত। লোভ আর লালসা তাকে আরও হিংস্র করে তুলেছে। তুমি যদি দেখতে সে আমাদের ওপর কি

ভয়ংকর নিষ্পেষণ চালায়। দেখবে বনহুর এই দেখো.......ইলোরা তার দেহের বসন কিছুটা তুলে ধরলো—-তার নখ আর দাঁতের আঘাত...

বনহুর চোখ ফিরিয়ে নিলো, অধর দংশন করলো সে।

ইলোরা বসন ঠিক করে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললো–আরও যদি দেখতে তাহলে তুমি...

বুঝেছি! নরপশু, জানোয়ার সে, নইলে...কথা শেষ না করে থেমে পড়ে বনহুর।

বলে ইলোরা–শুধু আমি নই, আমার মত আরও কত অসহায় মেয়েকে হামবার্ড এই ডুবু জাহাজের গোপন ক্যাবিনে আটকে রেখেছে। প্রতিদিন তাদের ওপরে হামবার্ড ও তার অনুচরগণ চালায় অকথ্য অত্যাচার। আমি এর বেশি আর বলতে চাই না। বনহুর, আমি জানতাম তুমি নির্দয় হৃদয়হীন, মদ আর নারী নাকি তোমার জীবনের সাথী কিন্তু আজ এই কদিনে তোমার সঙ্গে মিশে আমি অবাক হয়ে গেছি...।

বনহুর তার চোখ দুটো তুলে ধরলো ইলোরার মুখের দিকে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ ইলোরার মনের গোপন কথা জানাতে চায়।

বলে চলেছে ইলোরা–জানি তোমাকে বশীভূত করতে গিয়ে নিজেই আকৃষ্ট হয়েছি–বনহুর, তুমি আমার হৃদয়–মন জয় করে নিয়েছে। সত্যি অদ্ভুত মানুষ তুমি, আমার রূপযৌবন তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি।

বনহুর বললো–ইলোরা, তোমার মন পবিত্র আর পবিত্র বলেই তুমি এ কথাগুলো বলতে পারলে।

তোমাকে যত দেখছি তত বিস্মিত হচ্ছি।

হেসে বলে বনহুর—-আমি তোমারই মত একজন মানুষ।

বনহুর, আমি মৃত্যুবরণ করবো তবু তোমাকে কুপথে–নিতে পারবো না। তোমাকে স্পর্শ করার অধিকার আমার নেই। জানো বনহুর, আমি ফুলের মত

পবিত্র ছিলাম কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমাকে পরিহাস করেছে। জলদস্যু হামবার্ড আমার চাচাকে হত্যা করে আমাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে……।

তোমার যদি কষ্ট বা আপত্তি না হয় তাহলে যদি বলতে তোমার জীবন কাহিনী তাহলে আমি হয়তো বা তোমার কোনো উপকারে আসতে পারতাম।

জলদস্যু হামবার্ড তার দলবল নিয়ে যেদিন আমাদের জাহাজে আক্রমণ চালিয়েছিলো সেদিন আমার সাথে ছিলেন বড় চাচা। তিনি আমাকে হিন্দোল বন্দর থেকে নিয়ে আসছিলেন আমার বাবা মার কাছে। বাবা এবং মা ছিলেন সুজা নগরে। বাবা সুজানগরে সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলেন বড় চাচা, মামা একটি ছেলের খোঁজ পেয়েছেন, বিদেশ থেকে বিয়ের ব্যাপারে দেশে আসছে। আমার ছবি দেখে ছেলে ও তার আত্মীয় স্বজনের পছন্দ হয়েছে। ছেলে এলেই বিয়ে হবে। আমি বড় চাচার কাছে থেকে পড়াশোনা করছিলাম। সংবাদ পেয়ে বড় চাচা আমাকে নিয়ে হিন্দোল থেকে রওনা দিলেন। আশা আর আনন্দে বুক আমার ভরে উঠেছিলো, কতদিন পর বাবা মার কাছে যাচ্ছি। তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপার……

হাঁ, আনন্দ লাগবার কথাই বটে। কথাটা বললো বনহুর।

ইলোরার চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো– সব আশা–আনন্দ এক ঝটকায় নিভে গেলো যেমন করে ঝড়ো হাওয়ায় প্রদীপ নিভে যায়। থামলো ইলোরা।

বনহুর বুঝতে পারলো ইলোরার হৃদয়ে প্রচন্ড একটা ঝড় উঠেছে, যার আঘাত সে সহ্য করতে পারছে না। সান্তনা দেবার মত কোনো কথা সে খুঁজে পেলো না এই মুহূর্তে।

একটু থেমে ইলোরা আবার বলে–তুমি জানো না বনহুর নারীদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ইজ্জত……আজ আমি সর্বহারা। শুধু–আমি নই, আমার মত আরও বহু নারীকে এরা ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে যাদের নিয়ে হমবার্ড ও তার অনুচরগণ আনন্দ আর ফুর্তি করে যখন খুশি তখন……

থাক আর বলতে হবে না ইলোরা, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তবে তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে পারো তাহলে—-আমি তোমাদের সবাইকে হামবার্ডের

কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবো বলে আশা করি।

সত্যি বলছো?

হাঁ ইলোরা?

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হামবার্ড, কর্কশ কঠিন গলায় বললো–সে সুযোগ তোমার কোনোদিন হবে না বনহুর।

ইলোরা ভীষণভাবে চমকে উঠলো, ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে তার মুখমন্ডল।

হামবার্ড তার এবং বনহুরের কথাগুলো শুনে ফেলেছে তাই ইলোরার হৃদকম্প শুরু হলো। ইলোরা ভাবতেও পারেনি হামবার্ড আনন্দ–ফুর্তি ছেড়ে এখন এখানে আসবে। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো হামবার্ডের মুখের দিকে। হামবার্ডের পেছনে আরও দুজন ভীষণ আর ভয়ংকর চেহারার লোক। তাদের হাতে রশি আর চাবুক রয়েছে।

ইলোরা বুঝতে পারলো সে যে বনহুরের কাছে গোপনে আসে তা কেউ বলেছে হামবার্ডকে এবং সে কারণেই হামবার্ড চাবুক আর রশিসহ দুজন অনুচরণ নিয়ে স্বয়ং হাজির হয়েছে।

হামবার্ড অনুচরদ্বয়কে নির্দেশ দিলো ইলোরাকে বেঁধে নিয়ে যেতে।

আদেশ পালন করলো হামবার্ডের অনুচর দুজন।

তারা রশি দিয়ে ইলোরাকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, তারপর টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেলো বনহুরের ক্যাবিন থেকে।

নেশায় ঢুলু ঢুলু হামবার্ড, এ সময় বনহুর ওকে সহজেই কাবু করতে পারে কিন্তু তা সে করলো না। নিশ্চুপ লক্ষ করে গেলো সবকিছু।

ইলোরা যা বলেছে তা সব সত্যি আর মর্মান্তিক। পাষন্ড জলদস্যু হামবার্ড অসহায় তরুণীদের বন্দী করে রেখে তাদের ওপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্মম অত্যাচার। ইলোরার দেহে যে ধরনের ক্ষত বনহুর দেখলো তা অবর্ণনীয়……।

হামবার্ড কিন্তু চলে যায়নি, সে বললো–বনহুর, তুমি কোনোদিন আমার হাতের মুঠা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তোমার প্রয়োজন আছে বলেই আমি তোমাকে জীবিত রেখেছি–নইলে তোমাকে আমি পিপীলিকার মত হত্যা করতাম। শুধু তোমাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আমি মিস ইলোরাকে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে তোমাকে বিপরীত পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে।

বনহুর এতক্ষণে কথা বললো–মিস ইলোরাকে শাস্তি দিয়ে তুমি কোনো লাভ করতে পারবে না হামবার্ড–কারণ তুমি তাকে যে কারণে পাঠিয়েছিলে তাই সে করেছে বা করবার চেষ্টা করছে। অবশ্য মিস ইলোরার চেয়ে তুমি নিজে আমাকে বেশি আকৃষ্ট করতে পারবে

কি রকম? বললো হামবার্ড।

কোনো নেশা আমার নেই। কাজেই মদ বা নারী–এ দুটোর একটাও আমাকে বিচলিত করতে পারবে না বরং তুমি যা চাও তা আমি করবো।

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি যদি তুমি কোনো প্রমাণ দেখাও।

হাসলো বনহুর।

হামবার্ড বললো–তোমার চেয়েও আমি নতুন সে কথা ভুলে যেও না বনহুর।

তেমন বোকা আমি নই হামবার্ড। তুমি যে অত্যন্ত নতুন তার প্রমাণ তুমি নিজে।

তার মানে?

বনহুরকে যে কৌশলে বন্দী করতে পারে তাকে বুদ্ধিহীন বলা যায় না। যাক বলো আমাকে কি করতে হবে?

পূর্বেই বলেছি সেই মহামূল্যবান সম্পদ যা তুমি নীলনদের তলদেশের ভয়ঙ্কর স্থান হতে উদ্ধার করে রাণীকে দিয়েছো আমি ওটা চাই……

হামবার্ডের কথা শেষ হয় না, একজন অনুচর ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করে বলে–একটি জাহাজ আমাদের টেলিভিশন পর্দায় ধরা পড়েছে…

যাত্রীবাহী না মালবাহী জাহাজ?

যাত্রীবাহী জাহাজ এবং আমাদের অটোমিটার যন্ত্রে ধরা পড়েছে সে জাহাজে অনেক স্বর্ণ। আছে।

বল কি!

হাঁ সর্দার।

চলো....যেতে পা বাড়িয়েই ফিরে দাঁড়ালো হামবার্ড। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–বনহুর, তুমি আমাকে সাহায্য করবে আমার প্রধান সহচর হিসেবে আমি তোমার কাজ লক্ষ করবো। আমার হাতে থাকবে রিভলভার অথবা ক্ষুদে পিস্তল– কি বলল রাজি?

বনহুর মাথা নেড়িয়ে বললো–রাজি।

হামবার্ড বললো–এসো তাহলে আমার সঙ্গে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং অনুসরণ করলে হামবার্ডকে। কয়েকটি ক্যাবিন পেরিয়ে একটি ক্যাবিনে এসে দাঁড়ালো হামবার্ড। সম্মুখে নানা ধরনের সুইচ এবং মেশিনপত্র। একটা সুইচে চাপ দিতেই লিফটের মত একটি ঝুলন্ত বস্তু নেমে এলো এবং হামবার্ডের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো। অপর একটি বোম টিপলো হামবার্ড, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো ফিলটের দরজা।

হামবার্ড লিফটে উঠে দাঁড়াতেই বনহুর তাকে অনুসরণ করে লিফটে উঠে পড়লো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

লিফট এসে থেমে পড়লো একটা বিস্ময়কর ক্যাবিনে। ঐ ক্যাবিনের দেয়ালে নানা ধরনের সুইচ এবং বাল্ব জ্বলছে। সম্মুখে একটি টেলিভিশন পর্দা। টেলিভিশন পর্দাটা বিরাট ধরনের।

হামবার্ড একটা আসনে বসে সুইচ টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন পর্দায় পরিষ্কার পরিলক্ষিত হলো উক্ত তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষ। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ এবং ফেনাযুক্ত জলরাশি। দূরে একটি জাহাজ

দেখা যাচ্ছে। জাহাজটিকে ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে। হামবার্ড বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–উপরভাগে আরও একটি ক্যাবিন আছে, সেই ক্যাবিনে বসে আমার বিশ্বস্ত অনুচরগণ টেলিভিশন পর্দায় দেখছে এবং তারা আমাকে সংকেত দিচ্ছে। জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাদের ডুবুজাহাজের কাছাকাছি এসে পড়বে। তখন আমরা তলদেশ থেকে আক্রমণ চালাবো।

বনহুর বুঝতে পারলো হামবার্ড শুধু দস্যুই নয় সে একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীও বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একটা জানোয়ার।

কি ভাবছো বনহুর?

ভাবছি তুমি অতি বুদ্ধিমান।

শুধু তুমি কেন সবাই জানে আমি একদিন সম্রাট সেকেন্দ্রারুমীর মত বিশ্ব জয় করবো।

বনহুর হেসে বললো–আলবৎ করবে, কারণ তুমি জন্তুর মত ভয়ংকর…

কি বললে?

তোমার শক্তি এবং কুবুদ্ধি আছে।

স্পষ্ট করে বলো?

সম্মুখে টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো বনহুর–ঐ দেখো জাহাজখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হাঁ। এবার আমরা দ্রুত সমুদ্র তলদেশ দিয়ে এগিয়ে যাবো। বনহুর, তোমাকেই এবার আমার হয়ে কাজ করতে হবে। আমার পিস্তল তোমাকে পরিচালনা করবে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলো হামবার্ডের মুখের দিকে। আজ নতুন নয় কতবার তাকে কেউ কোনোদিন বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি।

কি ভাবছো বনহুর?

কেমনভাবে তোমাকে সাহায্য করবো তাই ভাবছি।

হাঃ হাঃ হাঃ! অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো হামবার্ড। তারপর বিকৃত মুখভঙ্গি করে বললো–তোমাকে কিছু শেখাতে হবে এটা তাজ্জব কথা। তুমি নেকামি করছো। কথাগুলো বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো হামবার্ড এবং একটা কলিং বেল টিপলো।

অমনি সম্মুখে জ্বলে উঠলো একটা লাল আলো। একটা শব্দ শোনা গেলো, হুইসেলের শব্দের মত তীব্র। বনহুর অনুমানে বুঝতে পারলো ডুবুজাহাজটি দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করেছে।

টেলিভিশন পর্দায় জাহাজখানাকে আরও নিকটবর্তী মনে হচ্ছে। বনহুর ভাবলো, জাহাজখানার যাত্রিগণ নিশ্চিন্তভাবে এই মুহূর্তে বিশ্রাম করছে কিন্তু তলদেশ হতে এগিয়ে যাচ্ছে যমদূত। বনহুর ভাবছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে ভীষণ একটা শব্দ হলো।

হামবার্ড বললো–কাজ উদ্ধার হয়েছে বনহুর। জাহাজখানাকে ঘায়েল করা হয়েছে। অল্পক্ষণেই জাহাজখানা গভীর অতলে তলিয়ে যাবে…

সর্বনাশ, এ কাজ তুমি করলে কেন? জাহাজখানাকে ধ্বংস করে দেওয়ার মত তোমার মনোভাব হলো কি করে?

আবার সেই বিকট হাসি হাসলো হামবার্ড, বললো–কিছু ভাবার সময় নেই। তা ছাড়া তোমার প্রশ্নের জবাবও এখন দেবো না। চলো, আমার অনুচরগণ জাহাজখানার তল ফাঁসিয়ে দিয়ে পথ করে দিয়েছে..

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে হামবার্ডকে চেপে ধরলো এবং তাকে পাশের একটি ছোট্ট ক্যাবিনে টেনে নিয়ে চললো। হামবার্ড জানতো না বনহুরের দেহে এত শক্তি এবং প্রস্তুতও ছিলো না সে বনহুর যে তাকে আক্রমণ করবে।

হামবার্ডকে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো বনহুর। প্রথমেই তার মুখে রুমাল খুঁজে দিয়েছিলো সে। রুমাল গুঁজে দেবার সময় ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়েছিলো। অন্যান্য অনুচর সবাই তখন জাহাজে লুটতরাজ করার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেখান হতে সরে পড়েছিলো।

বনহুর সেই ফাঁকে জলদস্যু হামবার্ডকে আটকে ফেললো এবং হামবার্ডের রিভলভার তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সেই বিস্ময়কর ক্যাবিন থেকে।

অনুচরগণ ছুটছে সবাই বর্শা আর রাইফেল হাতে। বনহুর তাদের সবাইকে নিয়ে যাত্রীবাহী জাহাজের দিকে এগুলো।

অনুচরগণ কেউ তাকে বাধা দিলো না, কারণ সবাই জানে বনহুরকে হামবার্ডের আয়ত্তে এনেছে এবং সে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে হামবার্ডের। কাজেই কেউ তাকে লক্ষ্য না করে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

বনহুরও এগুলো ওদের সঙ্গে।

ডুবুজাহাজখানা এমনভাবে যাত্রীবাহী জাহাজখানার তলে সংযুক্ত হয়ে গেছে যে সমুদ্রের পানি কোনোক্রমে ঐ জাহাজে প্রবেশে সক্ষম হবে না। একটা সুড়ঙ্গপথ তৈরি হয়ে গেছে ডুবুজাহাজ হতে যাত্রীবাহী জাহাজখানার তলদেশ দিয়ে। যখন যাত্রীবাহী জাহাজখানা লুটতরাজ করা শেষ হবে তখন ডুবুজাহাজখানা তার গুড় টেনে নেবে, মানে সুড়ঙ্গপথটা ডুবুজাহাজের মধ্যে প্রবেশ করবে। তখনই সমুদ্রের পানি প্রবেশ করবে যাত্রীবাহী জাহাজখানার ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে জাহাজখানা কয়েক মিনিটের মধ্যে।

বনহুর সুড়ঙ্গপথ ধরে যাত্রীবাহী জাহাজখানায় উঠে পড়বার সময় ভালভাবে লক্ষ করলো এবং বুঝতে সক্ষম হলো সবকিছু। বনহুরের হাতে ছিলো রিভলভার আর পকেটে ছিলো বেশ কিছু গুলি।

যাত্রীবাহী জাহাজখানায় উঠে এলো বনহুর হামবার্ডের দলবলের সঙ্গে। বনহুর লক্ষ্য করলো প্রায় সবাই ডুবুজাহাজ থেকে যাত্রীবাহী জাহাজখানায় উঠে এসেছে। হত্যা আর লুট শুরু হয়ে গেছে ভীষণভাবে। চারদিকে যাত্রীদের আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চিৎকার।

গভীর সাগরতল থেকে তাদের এমন আক্রমণ আসতে পারে ভাবতেও পারেনি জাহাজের যাত্রিগণ। প্রথমেই জলদস্যুদল হত্যা করেছে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে।

বনহুর ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে প্রবেশ করে দেখতে পেলো ক্যাপ্টেনের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ উবু হয়ে পড়ে আছে ক্যাবিনের মেঝেতে।

বনহুর হাটু গেড়ে বসে পড়লো ক্যাপ্টেনের দেহের পাশে। ডান হাতে চীৎ করে ফেললো, কিন্তু কোনো ফল হলো না, বহুক্ষণ পূর্বে তার প্রাণ দেহ ত্যাগ করেছে।

এগিয়ে গেলো বনহুর এবং এমন এক স্থানে এসে দাঁড়ালো যেখানে নির্জন, কেউ তাকে দেখতে পাবে না অথচ সে সবাইকে দেখতে পাবে।

আর্তনাদ আর গুলীর শব্দে জাহাজখানা প্রকম্পিত হচ্ছিলো। বনহুর আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো দস্যু হামবার্ডের অনুচরদের ওপর। যখনই একজন তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো তখনই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিলো বনহুর এবং লোকটা গুলি বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে পড়ে যাচ্ছিলো কারণ ঐ স্থানটি ছিলো জাহাজের নিভৃত একটি রেলিংয়ের কিনার। স্থানটি এত স্বল্প পরিসর যার জন্য দেহটা কাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রবক্ষে পড়ে যাচ্ছিলো।

বেশ কিছু সংখ্যক জলদস্যুকে বনহুর খতম করলো সবার অগোচরে।

এবার বনহুর সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়ালো।

তার কানে এলো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।

লক্ষ করতেই দেখলো একজন জলদস্যু যাত্রীবাহী জাহাজ হতে একটি তরুণীকে জোরপূর্বক কাঁধে তুলে নিয়ে ডুবুজাহাজে প্রবেশ করছে।

বনহুর আড়াল থেকে জলদস্যুটির পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

সংগে সংগে লোকটা পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে।

তরুণীটিও পড়ে গেলো পাশে।

বনহুর এবার জলদস্যুটির বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো।

লোকটা এবার তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো।

তরুণীটি ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো বনহুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

তরুণী ভয়ে দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিলো।

বনহুর বললো–পালাতে চেষ্টা করবেন না এবং এখানে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকুন।

তরুণী বনহুরের কন্ঠে শুনতে পেলো আশার প্রতিধ্বনি। সান্তনার বাণীর আভাস পেলো সে তার গলার স্বরে! অবাক হয়ে তাকালো তরুণী তার দিকে।

তখন বনহুরের কথা বলার সময় নেই, সে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারের গুলি বের করছে আর দ্রুতহস্তে রিভলভারে ভরে নিচ্ছে। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো বনহুর সুড়ঙ্গপথের মুখে। জলদস্যগণ যাত্রীদের মালামাল হরণ করে যখন এক এক করে সেই অদ্ভুত সুড়ঙ্গপথে ডুবু জাহাজে প্রবেশ করছিলো তখন বনহুরের রিভলভারের গুলি নিহত করছিলো তাদের এক একজনকে।

যারা যাত্রীবাহী জাহাজে মহা উল্লাস করে লুটতরাজ সাঙ্গ করে ফিরছিলো তাদের কাউকেই বনহুর বাদ দিলো না। ডুবুজাহাজে চালক এবং হামবার্ড ছাড়া ত্রিশজন জলদস্যু ছিলো।

বনহুর সবাইকে হত্যা করলো সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে। আর কিছু হত্যা করেছিলো যাত্রীবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনের জানালাপথে। বনহুর তবু জানে না আরও কতজন ডুবু জাহাজখানায় আছে।

বনহুর লক্ষ করলো আর কেউ আসছে না।

মৃতদেহগুলো বনহুর টেনে সুড়ঙ্গপথটির গোপন একস্থানে পাকার করে ফেললো। কারণ যারাই যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে আসছিলো তারা আর ডুবুজাহাজের গহ্বরে প্রবেশে সক্ষম হচ্ছিলো না, কারণ প্রবেশমুখেই বনহুর তাদের খতম করে টেনে নিচ্ছিলো আড়ালে।

এরপর আর কেউ আসছে না।

তবে কি সবাই এসে গেছে.....বনহুর পুনরায় যাত্রীবাহী জাহাজে উঠে এলো। যাত্রীদের করুণ আর্তনাদে ভরে উঠেছে জাহাজখানা।

যে তরুণীটিকে বনহুর উদ্ধার করলো সেও বনহুরের সংগে যাত্রীবাহী জাহাজে উঠে এলো। ছুটে গেলো এক ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর তার পেছনে এগিয়ে গেলো।

তরুণী ক্যাবিনে প্রবেশ করেই আর্তনাদ করে দুহাতে চোখ ঢাকলো–আব্বু, আব্বু..

বনহুর দেখলো মেঝেতে চীৎ হয়ে পড়ে আছে এক বৃদ্ধ। পাশে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে। এখনও চোখ দুটো তার খোলা রয়েছে। হয়তো বা কন্যাকে দেখার জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিলো। তাই চোখ দুটো তেমনি চেয়ে আছে।

হাঁটু গেড়ে বসে বনহুর বৃদ্ধের চোখ দুটো বন্ধ করে দিলো।

তরুণী এবার আছাড় খেয়ে পড়লে তার রক্তাক্ত দেহের ওপর। আকুল স্বরে কাঁদতে লাগলো। চারদিক থেকে করুণ কান্নার রোল শোনা যাচ্ছে।

বনহুর তরুণীকে লক্ষ্য করে বললো–একমুহূর্ত আর বিলম্ব করা উচিত হবে না আপনাদের, কারণ এ জাহাজের তলদেশে বিরাট একটি ছিদ্রপথ করা হয়েছে। এক্ষুনি তলিয়ে যাবে জাহাজখানা। শুধু আপনি নন এ জাহাজের যারা জীবিত আছে তাদের সবাইকে সরে পড়তে হবে, নইলে মৃত্যু অনিবার্য।

তরুণী চোখ তুলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। তার দৃষ্টি ঘৃণাভরা তবু সন্দেহ জাগছে তার মনে, কারণ সে নিজ চোখে দেখেছে এই লোকটা সে জলদস্যুদের সবাইকে হত্যা করেছে এবং গোপন করে ফেলেছে। কি উদ্দেশ্য এর?–ভাবে তরুণী।

বনহুর তার মনোভাব বুঝতে পারে। তাই সে বলে–জানি আপনি ভাবছেন আমি আপনার ক্ষতি সাধন করবো। কিন্তু মিছামিছি ভাবছেন, শিগগির চলে আসুন আমার সঙ্গে।

এবার তরুণী উঠে দাঁড়ালো এবং কান্নাজড়িত রাগান্বিত কণ্ঠে বললো–জানি তোমরা সবাই জলদস্যু। আমার বাবাকেই শুধু হত্যা করোনি তোমরা, তোমরা হত্যা করেছে আর সবাইকেও। লুটতরাজ করে নিয়েছে আমাদের সবকিছু.......

যা বলবার পরে বলবেন এখন আপনারা যারা জীবিত আছেন তারা সবাই চলে আসুন আমার সঙ্গে.....কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ তলিয়ে যাবে।

বনহুর তরুণী এবং অন্যান্য যাত্রীসহ ডুবুজাহাজের সুড়ঙ্গপথে নেমে এলো নিচে।

যাত্রিগণ যারা জীবিত ছিলো তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কারণ জাহাজখানা ডুবে গেলে একটিরও প্রাণ রক্ষা পাবে না। মরতেই যদি হয় তাহলে উপায় কি নিজেকে রক্ষা করার, তাই বনহুরকে ওরা বিশ্বাস না করে পারলো না।

বনহুর আহত ব্যক্তিদের একে একে কাঁধে তুলে নিয়ে এলো এবং সবাইকে একটি বড় ক্যাবিনে এনে রাখলো। কারণ বনহুর নিজেও ঠিক জানে না, ডুবুজাহাজে এখনও কতজন জলদস্যু জীবিত আছে।

বনহুর বললো–আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তরুণীটি একপাশে অন্যান্য মহিলার মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে পিতার জন্য কাঁদছিলো। বনহুর তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। হাতে তার উদ্যত রিভলভার।

জলদস্যু হামবার্ড বন্দী অবস্থায় আছে, বনহুর একবার তার ক্যাবিনের দিকে এগুলো, কিন্তু কি যেন ভেবে এগিয়ে গেলো ডুবুজাহাজখানার ইঞ্জিনের দিকে।

উদ্যত রিভলভার হাতে বনহুর প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। দেখলো তিনজন লোক সেই ক্যাবিনে বসে আছে, তাদের সম্মুখে নানা ধরনের মেশিন এবং যন্ত্রপাতি। নানা রকম সুইচ রয়েছে, আছে হ্যান্ডেল এবং টেলিভিশন পর্দা।

বনহুর প্রবেশ করেই দেখলো তিনজন সম্মুখে মিটারের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মিটারের পাশে তিনটি লাল বাল্ব জ্বলছে।

দরজায় প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

পদশব্দে ফিরে তাকালো ওরা তিনজন।

বনহুর রিভলভার উদ্যত রেখে বললো–তোমরা এখন আমার হাতের মুঠায়। একচুল নড়েছো কি মৃত্যুবরণ করেছে।

তিনজনই ডুবুজাহাজখানার চালক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা বনহুরকে দরজার মুখে উদ্যত রিভলভার হাতে দেখতে পেয়ে ভীষণ চমকে উঠলো। ওরা ভাবলো ব্যাপার কি, মালিক হামবার্ড কোথায়? জলদস্যুদল যারা যাত্রীবাহী জাহাজে লুটতরাজ করতে গিয়েছিলো তারা সবাই ডুবুজাহাজে ফিরে এসেছে কিনা তাই বা কে জানে। ভীষণ ভড়কে গেলো চালক তিনজন।

বনহুর বুঝতে পারলো এই তিনজন আর হামবার্ড ছাড়া জলদস্যুদের আর কেউ জীবিত নেই। সবাইকে সে খতম করে ফেলেছে। নইলে কেউ না কেউ তার নজরে পড়তো।

বনহুর গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললো–জাহাজখানাকে এবার যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে মুক্ত করে নাও এবং যে কোনো বন্দর অবলো–জাহাজখানাকে কেউ তার নজরে পড়তে

রিভলভারের মুখে চালকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, তারা অনুধাবন করলো বনহুর কৌশলে ডুবুজাহাজখানা করায়ত্ত করে নিয়েছে নইলে এতক্ষণে হামবার্ডের সংকেত চিহ্ন লাল আলোর পরিবর্তে নীল আলো জ্বলে উঠতো। সবাই তাই তাকি যছিলো আলোর বাল্বের দিকে। পাশেই ছিলো অদ্ভুত মিটার। মিটারে ছিলো তাদের দৃষ্টি কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কোনো সংকেত না পাওয়ায় বেশ ঘাবড়ে উঠেছিলো তারা তিনজন। ঠিক ঐ সময় হলো বনহুরের আবির্ভাব।

চালক তিনজন ভীষণ ভড়কে গেলো। কিন্তু বনহুরের হাতের রিভলভার তাদেরকে সজাগ করে তুললো।

বনহুর পুনরায় বললো–যাত্রীবাহী জাহাজখানাকে মুক্ত করে দাও! একটু বিলম্ব হলে গুলি চালাবো।

অগত্যা হামবার্ডের অনুচররা এবার নিজেদের কাজ শুরু করলো। একজন একটি হ্যান্ডেল ঘুরাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হলো।

বনহুর বুঝতে পারলো যাত্রীবাহী জাহাজের তলা হতে ডুবুজাহাজের সুড়ঙ্গপথ খসে এলো। লোকটা তখনও হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে।

বনহুর বললো–এবার ডুবুজাহাজখানাকে কোনো বন্দর অভিমুখে নিয়ে চলো। যদি কোনো চালাকি বা কারসাজি করতে চাও তাহলে রক্ষা পাবে না।

চালকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো।

বনহুরের আদেশ পালনে বাধ্য হলো তারা।

সম্মুখে কাঁচের শার্শীর মধ্যে দেখা গেলো সমুদ্রের তলদেশে ডুবুজাহাজখানা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। ডুবুজাহাজখানা গভীর অতলে লিয়ে আবার চলতে শুরু করলো।

চালকরাই সুইচ টিপছে, কখনও বা হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে।

বনহুর মুহূর্তের জন্যও রিভলভারের কথা ভুলে গেলো না। সে দরজায় হেলান দিয়ে ভালোভাবে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো। চালকরা ঠিকভাবে চালাচ্ছে কিনা মিটারে লক্ষ্য করছিলো বনহুর। এসব কাজে বনহুর যে একেবারে কাঁচা তা নয়। সেও একজন দক্ষ চালক, যে কোনো যান চালনায় তার দক্ষতা আছে।

চালকরা ঠিকভাবে জাহাজটিকে চালনা করছে কিনা বনহুর তা বুঝতে পারছে। বনহুর চায় যাত্রীবাহী জাহাজ থেকে যে সব যাত্রীদের সে উদ্ধার করেছে তাদেরকে ঠিকভাবে কোনো বন্দরে পৌঁছে দেওয়া।

বনহুর যখন যাত্রীদের কথা ভাবছে তখন ইলোরা এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে! বললো সে আমরা সব জানি। সব লক্ষ্য করেছি আড়াল থেকে। আমরা যত বন্দী লাঞ্ছিত মহিলা এ জাহাজে আছি সবাই চাই তোমাকে সাহায্য করতে। বলল কি করতে হবে?

ইলোরার মুখে কথাটা শুনে এবং তারা সব আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে জেনে খুশি হলো বনহুর। একটা অনাবিল তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। বললো– সত্যি মিস ইলোরা কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।

ইলোরার চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। অন্যান্য বন্দী তরুণী ইলোরাকে সমর্থন করে, তারা এই জঘন্য অবস্থা হতে মুক্তি চায়। সবাই চায় বনহুরকে সাহায্য করতে। বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো ইলোরা–বলো কি করতে হবে?

তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

হাঁ

তুমি.....

শুধু আমি নই আমরা যারা বন্দী অবস্থায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি সকলেই তোমাকে সাহায্য করবো। আরো শুনে রাখো আমরাও অস্ত্র চালনা জানি......

সত্যি?

হাঁ!

তাহলে তুমি এদের আয়ত্তে রাখো আমি আর একজনের সঙ্গে মোকাবেলা করে আসি।

ইলোরা বনহুরের হাত থেকে রিভলভার হাতে নেবার পূর্বে করতালি দিলো। সঙ্গে সঙ্গে বারো–তেরো জন তরুণী এসে দাঁড়ালো সেখানে।

বললো ইলোরা–তোমরা নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে চলে এসো, এতদিন গোপনে যে অস্ত্র শিক্ষা আমি দিয়েছি তোমাদের সকলকে, সেই অস্ত্র শিক্ষা আজ কাজে লাগাতে হবে।

বনহুরের চোখেমুখে ফুটে ওঠে একটা উদ্দীপ্ত ভাব।

তরুণীগণ বেরিয়ে যায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা অন্ত্র নিয়ে চলে আসে বিপুল উদ্দীপনা আর হিংস্র ভাবাবেগ নিয়ে। ওদের এই রূপ দেখে চালকগণ ভীষণ ভড়কে যায়।

বনহুর এবার নিজের রিভলভার ইলোরার হাতে দিয়ে বলে–এদেরকে তুমি পরিচালনা করবে। চালক চিনজন যেন তাদের আসন থেকে সরে না যায়।

ইলোরা বনহুরের হাত থেকে রিভলভার নিয়ে চালক তিনজনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে–বোন, তোমরাও তোমাদের অস্ত্র এদের দিকে উদ্যত করে রাখো, এরা যেন কোনো রকম। বদমাইসি করতে না পারে।

ঠিক বলেছো ইলোরা, তাহলে আমি ওদিকে দেখতে পারি। কথাটা বলে বনহুর বেরিয়ে গেলো।

সোজা সে চলে এলো সেই ক্যাবিনে, যে ক্যাবিনে বন্দী রয়েছে জলদস্যু হামবার্ড একটি চোরাকুঠুরীতে। বনহুর তার মুখে রুমাল খুঁজে হাত-পা শক্ত রশিতে বেঁচ্চে ফেলে রেখেছিলো, যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে।

এবার বনহুর খুলে ফেললো চোরা কুঠুরীটার দরজা।

দরজা খুলতেই জলদস্যু হামবার্ড সাপের মত ফোঁস করে উঠলো। তবে তার নড়বার কোনো উপায় ছিলো না।

বনহুর টেনে তুললো তাকে জামার কলার ধরে। বের করে আনলো কুঠুরীর ভেতর থেকে। এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলো মেঝেতে, তারপর বললো–হামবার্ড, তোমার অত্যাচারের কাহিনী যা জানতাম তার চেয়েও ভয়ংকর তার রূপ। এবার তোমার বিচার হবে তোমারই বড় সাধের ডুবুজাহাজে……

মুখে রুমাল গোঁজা থাকায় সে কোনো কথা বলতে পারছে না, শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ করে তার ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

বনহুর ওকে টেনে দাঁড় করালো, তারপর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার নাকে।

হুমড়ি খেয়ে পড়লে হামবার্ড।

যদিও সে দৈহিক শক্তিতে বনহুরের চেয়ে বড় কম ছিলো না তবু হাত-পা শক্ত করে বাধা থাকায় বনহুরের ঘুষি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলো। চেষ্টা করছিলো নিজকে মুক্ত করার। কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হচ্ছিলো না। বনহুর ওকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলো প্রকান্ড একটি ক্যাবিনে।

এক পাশে একটি দরজা।

লাল আলো জ্বলছে দরজার ওপরে।

বনহুর দরজার পাশে সুইচ টিপতেই দরজা খুলে গেলো। বনহুর দেখলো ওপাশে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে এবং একটি চাকা ভন্ ভন্ করে ঘুরছে। চাকার দাঁতগুলো অত্যন্ত ধারালো। কোনো বস্তু ঐ দরজার ওপাশে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খন্ড–বিখন্ড হয়ে যাবে। এটা ভীষণ ভয়ংকর ক্যাবিন।

হামবার্ডের মুখোভাব ভয়ার্ত হয়ে উঠলো।

ওটা তার একটা মৃত্যু ফাঁদ।

ডুবু জাহাজখানার পাওয়ার হাউস সেটা। সমুদ্রের জলস্রোত হতে কারেন্ট তৈরি হচ্ছে এবং সেই প্রবল শক্তি ডুবুজাহাজখানাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উল্কাবেগে।

ভীষণ বেগে দাঁতগুলো ধুরছে।

বনহুর সেই ভয়ংকর মেশিন ক্যাবিনের দরজা খুলতেই হামবার্ডের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, সে বুঝতে পারলে তাকে ঐ মেশিনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে।

হামবার্ডের ভাবনা মিথ্যা নয়।

বনহুর দেখেছিলো ঐ মেশিন ক্যাবিনটা, যার ভয়ংকরতা সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা ছিলো তার মনে। হামবার্ডকে শাস্তি দেবার একমাত্র পথ ওটা।

হামবার্ডের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর–এতদিন যে পাপ তুমি করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত করো.....কথাটা বলে জলদস্যু হামবার্ডকে ঠেলে দিলো সেই ভয়ংকর মেশিন কক্ষটার মধ্যে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর।

সে হাসি যেন তার থামতে চায় না।

হত্যার আনন্দে আত্মহারা সে।

বনহুর সেই ভয়ংকর মেশিনকক্ষের মুখ বন্ধ করে দিলো, তারপর ফিরে এলো যেখানে ইলোরা তার সঙ্গিনীগণ অস্ত্র হাতে চালকদের পরিচালনা করছিলো।

ইলোরা বললো–কোথায় সেই হামৰার্ড নরপশুটা?

তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে তারপর এসেছি। বললো বনহুর।

ইলোরার দুচোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে, বলে সে–এত সহজে তুমি জলদস্যু হামবার্ডের মত নরশয়তানকে যমালয়ে পাঠাবে তা কল্পনা করতে পারি না, কারণ

সে শুধু নরশয়তানই নয়, সে একটা ভয়ংকর জানোয়ার যার মধ্যে আছে অসুরের শক্তি।

জানোনা ইলোরা, হামবার্ডের মত কত ভয়ংকর নরশয়তানকে আমি এমনি করে পরপারে পাঠিয়েছি।

সত্যি তুমি মহৎ, তাই ঈশ্বর তোমার সহায়।

ইলোরা তোমাকে দস্যু হামবার্ড বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিলো

কে মুক্ত করে দিলো?

আমার সহচরীগণ।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমি তাদেরকে। জলদস্যু হামবার্ড আর ইহজগতে নেই তার দেহ খন্ড–বিখন্ড হয়ে গেছে, আর সে ফিরে আসবে না কোনোদিন।

সত্যি তোমার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

বনহুর চালকদের লক্ষ্য করে বললো–এবার তোমরা আমার বশ্যতা স্বীকার করো নইলে তোমাদের অবস্থাও তোমাদের সর্দারের মত হবে। সেই নির্মম পরিণতির চেয়ে জীবন রক্ষা পাওয়া পরম ভাগ্য। কাজেই আমাকে তোমরা মেনে নাও এবং আমার নির্দেশ পালন করবে বলে সম্মত হও। বলো তোমরা রাজি?

ইলোরার হাত থেকে রিভলভারখানা বনহুর হাতে নিয়ে উদ্যত করে ধরলো এবং কঠিন কণ্ঠে বললো–যা বলবো সেইভাবে কাজ করবে। এই ডুবুজাহাজে প্রায় তিন শ আহত ব্যক্তি আছে যাদের সেবাযত্ন এবং ওষুধপত্রের একান্ত দরকার। ইলোরা, আমি এবার একই এদের পরিচালনা করবো। তোমরা যাও আহত যাত্রীদের সেবাযত্ন করোগে।

আচ্ছা আমি এদের নিয়ে সেখানে যাচ্ছি।

তাই করো। বললো বনহুর।

ইলোরা সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর চালকদের লক্ষ্য করে বললো–তোমরা কোনোরকম চালাকি করবে না। আমি তোমাদের কাউকেই হত্যা করতে চাই না, কারণ তোমাদের প্রয়োজন আছে এবং সেই কারণেই আমি এ কথা বলছি।

চালকগণ বেশ অনুভব করলো তাদের পরিত্রাণ নেই। বনহুর তাদের সর্দার হামবার্ডকে পরাপারে পাঠিয়েছে এবার তাদেরও ঐ অবস্থা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চালকগণ বনহুরকে মেনে নিলো।

এ ছাড়া উপায় ছিলো না কিছু।

ডুবু জাহাজে প্রচুর খাবার ছিলো, কাজেই খাবারের কোনো অসুবিধা হলো না। অসুবিধা হলো আহত যাত্রীদের নিয়ে। তাদের কারো রক্ত দরকার, কারো ব্যান্ডেজ বা ওষুধ পত্র দরকার কিন্তু রোগীদের কোনো ওষুধ দেওয়া যাচ্ছে না।

ইলোরা ও তার সঙ্গীদের সেবাযত্ন আহতদের অনেকখানি সুস্থ করে তুললো।

মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করে চলেছে ইলোরা ও তার সঙ্গিনীগণ। বনহুর মাঝে–মধ্যে গিয়ে খোঁজখবর নিতে ভোলেনি। প্রায়ই সে যায় ঐ ক্যাবিনগুলোতে, যে গুলোতে আহত ব্যক্তিরা। রয়েছে। তারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে শুধু বনহুরের প্রচেষ্টায়, নইলে কেউ আজ জীবনে বাঁচতে পারতো না, কারণ সেই জাহাজখানা সাগরের গভীর অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো।

এখন চালক তিনজন বনহুরের হাতের মুঠায়।

কৌশলে বনহুর এদেরকে নিজের আয়ত্তে এনেছে। চালকগণ বুঝতে পেরেছে তাদের পালাবার কোনো উপায় নেই। মালিক জলদস্যু হামবার্ডকে যে ব্যক্তি অতি সহজে হত্যা করতে সক্ষম হলো, যা তারা ভাবতেও পারে না তাকে কাবু করা বা তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

চালকগণ বনহুরের নির্দেশক্রমে এক বন্দর অভিমুখে তাদের ডুবু জাহাজখানাকে নিয়ে চলেছে।

বনহুর ইলোরা ও তার সঙ্গীদের নিয়ে অসুস্থ যাত্রীদের সেবাযত্ন করে চলেছে। সর্বক্ষণ তারা ব্যস্ত এদের নিয়ে। ইলোরা বলেছে আর আমাদের ভয় বা দুর্ভাবনা নেই। এবার আমরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবো।

ইলোরার কথায় তরুণীগণ খুশিতে আত্মহারা, তারা মনের আনন্দে অসুস্থ যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। বনহুর এটা লক্ষ্য করে পরম আনন্দ লাভ করছে। এক সময় ইলোরার পাশে গিয়ে বনহুর দাঁড়ালো।

ইলোরা আহত রোগীদের সেবা করছিলো, কখন ক্লান্তি নেমে আসে তার চোখে। একটা চেয়ারে বসে হেলান দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে। হাতে তার একটা বই ছিলো।

বনহুর দেখলে সবাই ঘুমিয়ে আছে।

ডুবু জাহাজে রাত বা দিন বুঝবার উপায় নেই। তবে বিস্ময়কর ঘড়ির মধ্যে বোঝা যায় এখন রাত না দিন। বনহুর ঘড়ি দেখেই বুঝলো এখন রাত। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ীই মানুষের চোখে নেমে আসে ঘুম, আর সেই ঘুম থেকে কেউ রেহাই পায় না। মানুষ এবং জীবজন্তুগুলোও আবেশে ঘুমিয়ে পড়ে অনাবিল শান্তির কোলে।

চালকরা তাদের নিয়মানুযায়ী জাহাজটিকে চালনা করে চলেছে বনহুরের নির্দেশ অনুযায়ী। বনহুর ঘরে ফিরে দেখছিলো সবকিছু।

তার চোখে ঘুম নেই।

যতক্ষণ না ডুবু জাহাজের যাত্রী যারা এখন অসহায় অবস্থায় আছে তাদের নিরাপদ স্থানে অবতরণ করিয়ে দিতে না পারবে ততদিন তাকে এমনি এক অস্বস্তির মধ্যে কাটাতে হবে।

বনহুর নির্বাক চোখে তাকালো ইলোরার দিকে। সবাই তাদের নিজেদের ক্যাবিনে চলে গেছে কিন্তু ইলোরা চলে যায়নি, সে আহত যাত্রীদের সেবাযত্ন করছিলো। এক সময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো পাশেই একটা চাদর জাতীয় সুন্দর কাপড় ভাঁজ করা রয়েছে। সেই চাদরখানার ভাজ খুলে ইলোরার শরীর ঢেকে দিলো সে।

ইলোরা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলো তার দেহের ওপরে চাদর দেওয়া রয়েছে। গভীরভাবে ভাবলো কে তার শরীরে এভাবে চাদর ঢাকা দিলো? তবে কি তার কোনো সহচরী। যখন জানলো সহচরীদের কেউ তার শরীরে চাদর ঢাকা দেয়নি তখন বেশ বুঝতে পারলো এটা বনহুরের কাজ। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এলো ইলোরার।

ধীর পদক্ষেপে ইলোরা বেরিয়ে এলো সেই ক্যাবিন থেকে। ভাবছে সে, সত্যি বনহুর এক মহা পুরুষ। যার মধ্যে কোনো লালসা নেই। সে এক পবিত্রময় পুরুষ।

আজ কদিন থেকে বনহুরকে দেখে আসছে ইলোরা। যতই ওকে দেখছে ততই মুগ্ধ বিস্মিত হচ্ছে। এই ডুবুজাহাজে বন্দী হওয়ার পর থেকে সূর্যের আলো তারা দেখেনি, বনহুর বলেছে তাদেরকে এবার পৃথিবীর আলো বাতাসের মধ্যে নিয়ে পৌঁছে দেয়া হবে।

কি যে আনন্দ আর খুশি লাগছে ইলোরার তা যেন ব্যক্ত করতে পারছে না সে। ইলোরা বনহুরের সন্ধান করে ফিরছিলো। হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করলো সমুদ্রতলদেশ যেখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, সেই শার্সীযুক্ত জানালার পাশে।

ইলোরা এসে পাশে দাঁড়ালো।

একটু হেসে ফিরে তাকালো বনহুর, বললো–ঘুম ভাঙলো?

ইলোরা কোনো জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছিলো।

বনহুর বললো–শোনো।

থামলো ইলোরা, প্রশ্নভরা চোখ দুটো তুলে ধরলো সে বনহুরের মুখে।

বনহুর বললো–বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ইলোরা। জানি অসুস্থ যাত্রীদের সেবাযত্নে তুমি অক্লান্ত……

কথা শেষ করতে দেয় না ইলোরা বনহুরকে, বলে ইলোরা– এ ক্লান্তি আমার মনে নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছে বনহুর। তুমি আমাকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

মানুষের সেবায় যে এত সুখ আমি জানতাম না।

ইলোরা।

হাঁ বনহুর। আর্তের সেবায় এত আনন্দ এত সুখ তা কোনোদিন অনুভব করিনি। আজ আমি মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করছি.....আর সে অনুভূতির সুযোগ দিয়েছো তুমি?

বনহুর কোনো কথা বলে না, সে স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকায় সমুদ্রতলে নানা ধরনের জীব এবং বিস্ময়কর উদ্ভিদগুলোর দিকে। অদ্ভুত এ দৃশ্য কতকগুলো ক্ষুদ্র আকৃতির মাছ মনের আনন্দে সামুদ্রিক উদ্ভিদগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। তাদের প্রতি লক্ষ করলে বেশ বোঝা যায় ওরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। যেন ওরাই এ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

বললো ইলোরা–কি দেখছো অমন করে?

ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলোকে।

সত্যি ভারী সুন্দর!

কিন্তু এখুনি যদি কোনো বৃহদাকার মৎস্যরাজের আবির্ভাব এখানে ঘটে তাহলে দেখবে এই সুন্দর পরিবেশ আর থাকবে না। একটা মৃত্যুর ভয়াল ছায়া ত্রাসের সঞ্চার করবে এবং এরা চকিতে হারিয়ে যাবে দৃষ্টির অন্তরালে। যেমন পৃথিবীর বুকে এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর ওপর দানবীয় আচরণ করছে... ইলোরা, জানি না কেন এ অনাচার অবিচার। এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে সদা নিষ্পেষিত করে চলেছে।

এমন কথা তুমি বলতে পারো? আমি জানতাম তুমিও একজন দস্যু। কঠিন নির্মম তোমারও হৃদয়......

বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে ইলোরা বনহুরের মুখের দিকে। যত ওকে দেখছে ততই বিস্মিত হচ্ছে সে–পৌরুষ দীপ্ত কঠিন মুখে সত্যের আস্বাদন ভারী অদ্ভুত। গভীর রাতের মেঘ গর্জনের মত গম্ভীর।

হাসি থামিয়ে বলে বনহুর–কি ভাবছো অমন করে?

সরে আসে বনহুর ইলোরার পাশে।

ইলোরা বনহুরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অদ্ভুত দুটি চোখে তার শান্ত দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ছোঁয়া।

ইলোরা বলে–ঐ দেখো একটা বৃহদাকার মৎস্যরাজ এগিয়ে আসছে।

বনহুর ফিরে তাকায় সেই শার্শীর দিকে।

বৃহৎ আকার মৎসটি অদ্ভুত ধরনের সামুদ্রিক মাছ। বিরাট তার মুখ গহ্বর হা করে এগিয়ে আসছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলো চকিতে ভয় পেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো। এবার তাদের গতির মধ্যে ভয়ার্ত একটা ভাব পরিলক্ষিত হলো। বৃহৎ মৎস্যরাজ তার বিরাট হা প্রসারিত করে ছোট্ট ছোট্ট মাছগুলোকে গলধঃকরণ করতে লাগলো।

বললো ইলোরা–দেখছো বনহুর ক্ষুদ্রের ওপর বৃহতের নির্মম আচরণ?

হাঁ দেখলাম! একটু থেমে বললো বনহুর–এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

কিন্তু এর কি কোনো বিহিত ব্যবস্থা নেই?

. জানি না।

বনহুর! তুমি না বুদ্ধিমান কিন্তু আমার এ প্রশ্নের জবাব তুমি দিতে পারলে না? আমি জানি এর জবাব তুমি দিতে পারবে না, কারণ চিরকাল সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এসেছে।

বনহুর ইলোরার মুখের দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলো। যা সত্য তা সবাই জানে। জীবজন্তু, পশুপক্ষী থেকে বিশ্বের সেরা জীব মানুষ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম নেই। অসহায় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার এ যেন একটা প্রকৃতির নিয়ম। এ নিয়মের যেন পরিবর্তন নেই.....যুগ যুগ ধরে এই অনাচার অবিচার চলে আসছে এবং আসবে যা জন্মাবার পর থেকে দেখে আসছি। একটু থেমে বললো বনহুর–বসো ইলোরা। তোমাকে নতুন একটা গল্প শোনাবো তবে কাল্পনিক নয় সত্য।

বসলো ইলোরা।

তার মনে কোনো দ্বিধা–দ্বন্দ–ভয় নেই, বনহুরকে ইলোরা নিজের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে, কারণ ওকে সে অন্তর দিয়ে যাচাই করেছে। ইলোরা বুঝি এই একটিমাত্র পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে যার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে লোভ–লালসাহীন একটি মানুষকে।

ইলোরা আসন গ্রহণ করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। সত্যি ইলোরা অভিভূত, বনহুরের নাম সে পূর্বেও শুনেছিলো, তাকে যে এত কাছে দেখবে কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। আর তখন ছিলো বনহুরের প্রতি একটা ঘৃণা, একটা ভীতিভাব। আজ সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছে ওকে……

বনহুর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো কিন্তু তার দৃষ্টি রইলো সেই শার্শীর দিকে, যে পথে সমুদ্রের তলদেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ডুবুজাহাজখানা এগিয়ে যাচ্ছে।

কাজেই সমুদ্রের তলভাগের বিভিন্ন দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে তাদের চোখে।

জাহাজখানা এখন জেরুবা বন্দর অভিমুখে চলেছে।

বনহুর সেই মেশিনকক্ষের দেয়ালে সমুদ্র তলদেশের মানচিত্র লক্ষ করে জেরুবা বন্দর অভিমুখে জাহাজখানা চালনার নির্দেশ দিয়েছে। জেরুবা বন্দর সবচেয়ে কাছে হবে। এটাই বনহুর লক্ষ করেছে সেই দেয়াল মানচিত্রে। জেরুবা বন্দরে অবতরণ করার পর সবাই পৃথিবীর মুক্ত আলোবাতাস উপভোগ করবে, সূর্যের আলোতে অবগাহন করবে সবাই। বনহুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

ইলোরা বললো–কি ভাবছো?

বনহুর ইলোরার কথায় সম্বিৎ ফিরে পায়, বলে–ও ভুলে গেছি তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

সত্যি করে বলবে কি ভাবছিলে?

ভাবছিলাম এই ডুবুজাহাজে যে সব আহত এবং অসুস্থ যাত্রী রয়েছে তাদের জেরুবা বন্দরে পৌঁছে দিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত হবো না, যতক্ষণ না তাদের কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে না দেওয়া হয়। ইলোরা পারবে না তোমরা এদের সেবাযত্ন করতে যেমন এই ডুবুজাহাজে করছো?

পারবো।

তারপর যখন এরা সুস্থ হয়ে উঠবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ আবাসে পৌঁছে দেবো। যে দেশে যার আবাসভূমি সেখানেই যাবে তোমরা।

কিন্তু......

থামলে কেন?

যদি সমাজ আমাদের ফিরে না নেয়? যদি কোথাও স্থান না পাই....

তোমাদের এ জীবনের জন্য তোমরা দায়ী নও। যে সমাজ কত নির্মম সে সমাজকে তোমরা ঘৃণা করতে শেখো।

আমরা যে উপায়হীন!

আমি তোমাদের প্রতিষ্ঠা করবো......যতক্ষণ তোমরা সমাজে স্থান না পাবে আমি ততক্ষণ তোমাদের পাশে থাকবো।

বনহুর, তুমি যে কথা শোনালে তা যেন সত্যি হয়।

হবে।

আমরা ধন্য হবো সেদিন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা বিবাহিতা, তাদেরকে স্বামী শ্বশুর গ্রহণ করবে কি?

নিজের দোষে নয়, অদৃষ্টের পরিহাসে অন্যের দ্বারা অপহরণ এবং লাঞ্ছিত হবার পর তাদের যদি সমাজ বা আত্মীয়স্বজন স্থান না দেয় তাহলে সে সমাজ, সে আত্মীয়স্বজন নাইবা থাকলো। তোমরা ভেবো না, দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করেছি।

কই, কি যে বলবে বলেছিলো বনহুর?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য–আমি কোনো উপায়ে বিস্ময়কর এক যানে মঙ্গলগ্রহে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু আমি নই, আমার সঙ্গে ছিলো আর একজন সঙ্গী। আমরা দুজন। কোনোক্রমে সেই অদ্ভুত যানে আরোহণ করে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছি। সে এক বিস্ময়কর দেশ।

তুমি মঙ্গল গ্রহে যেতে পেরেছ বনহুর?

হাঁ

সত্যি আশ্চর্য।

শুধু আশ্চর্য নয়, বিস্ময়করও বটে। কোনোদিন ভাবতে পারিনি আমি মঙ্গল গ্রহে যেতে সক্ষম হবো।

আমার কেমন যেন অবিশ্বাস লাগছে।

তোমার কেন, আমার নিজেরও বড় বিস্ময় লাগে। একটা অদ্ভুত যানে একদিন একসময় আমি এবং আমার সঙ্গী সহ সেই বিস্ময়কর স্থানে পৌঁছলাম। আমাদের এই পৃথিবীর মতই সেখানে বাস করে লোকজন এবং নানা ধরনের বৃক্ষাদিও রয়েছে।

তারপর?

তেমনি রয়েছে অদ্ভুত ভয়ংকর জীবজন্তু। তবে সূর্যের আলো সেখানে প্রখর নয়। বৃক্ষাদির রং সবুজের সমবোহে ভরা নয়, সব বেগুনী রঙের। ফলমূল সব বেগুনী! এমন কি মানুষগুলোও ফিকে গোলাপী।

ভারী সুন্দর তাহলে?

হাঁ, মানুষগুলো ফুলের মতই সুন্দর। পুরুষের সংখ্যা কম সেখানে, নারীর সংখ্যা বেশি। সেখানেও রাজা আছে প্রজা আছে, আছে হিংসা–বিদ্বেষ। রাজকন্যার নাম রী আর একটি মেয়ের নাম মৌ.......আনমনা হয়ে গেলো বনহুর, কি যেন গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবতে লাগলো।

বললো ইলোরা–কি হলো তারপর?

কোনো কারণে রীর চক্রান্তে নিহত হলো মৌ। ফুলের মত সুন্দর একটি জীবন অকালে ঝরে পড়লো……জানো ইলোরা, মৌ-এর রক্তের ছাপ, সেই রক্তের গন্ধ এখনও আমার সমস্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। আমার আশেপাশে মৌ-এর আত্মা ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়……।

ইলোরা অবাক হয়ে বনহুরের কথাগুলো শুনছিলো। দুই চোখে তার বিস্ময়। মঙ্গলগ্রহেও মানুষ আছে, তাদের মধ্যেও আছে হিংসা–বিদ্বেষ, তাদের মধ্যেও আছে হানাহানি। এ পৃথিবী ছাড়াও কোনো গ্রহে মানুষ থাকতে পারে এ কথা অনেকেই জানে না বা বিশ্বাস করে না। বনহুর এই পৃথিবীর মানুষ হয়ে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিলো সত্যি ভাবতে অবাক লাগে তার।

বনহুর আনমনা হয়ে পড়েছিলো, বললো ইলোরা–তোমার কাহিনী সত্যি আশ্চর্য। মঙ্গল গ্রহের কেউ তোমার মন কেড়ে নিয়েছিলো বনহুর, ভাবতে আমার অবাক লাগছে।

হাঁ ইলোরা, আমি মৌকে ভুলতে পারিনি। মৌ যে আমাকে ভালবাসবে এটা কল্পনার বাইরে……বনহুর সেই বিস্ময়কর কাহিনী ইলোরার কাছে বর্ণনা করলো।

সব শুনে ইলোরার মুখে পরিলক্ষিত হয় নতুন এক ভাবের উন্মেষ। বনহুরকে ইলোরাও যে নিজের অজান্তে কখন ভালবেসে ফেলেছে।

*

মিঃ লিংকো তার দলবল নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলো হিংস্র জীবজন্তু শিকারে। জীপ এবং কিছু জাল ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো তাদের সঙ্গে।

এই দলের নেতা মিঃ লিংকো।

যেমন দুর্দান্ত তার সাহস, তেমনি শক্তিশালী।

গভীর বনে দলবল নিয়ে প্রবেশ করা এবং হিংস্র জীবজন্তুর আটক করে বিদেশে চালান দেওয়া তাদের কাজ।

একদিন হঠাৎ দলটির নজরে পড়ে যায় জাভেদ।

গহন বনে মানুষ দেখে চমকে উঠেছিলো মিঃ লিংকো ও তার দলবল।

প্রথমে তারা মানুষের পায়ের ছাপ দেখেছিলো এক জলাভূমির পাশে। মিঃ লিংকো ও তার দলবল ভীষণ আশ্চর্য হলো, এমন জায়গায় মানুষের পায়ের ছাপ সত্যি বড় তাজ্জব ব্যাপার। পায়ের ছাপ লক্ষ করে তারা অগ্রসর হলো।

মিঃ লিংকো নিজে গাড়ি ড্রাইভ করছিলো।

এ ধরনের জীপ শহর অঞ্চলে কমই দেখা যায়। সাধারণ ড্রাইভার এ জীপ চালনা সহজে করতে পারবে না। অসমতল পথ দিয়ে, ঝোঁপঝাড় পিষে এ জীপ চলার পথ করে নেয়।

মিঃ লিংকো প্রথমে মানুষের পায়ের ছাপ লক্ষ করে অবাক হলেও সে মনে করলে হয়তো বা কোনো শিকারীর পায়ের ছাপ হবে। তবুও সন্ধান করে চললো তারা নিপুণ দৃষ্টি নিয়ে।

হঠাৎ দেখলো অদূরে একটি অশ্ব বিচরণ করে ফিরছে।

অশ্বটি সাধারণ অশ্ব নয়।

লিংকোর মনে বিপুল একটা সন্দেহ জাগলো।

জীবজন্তু গহন বনে বাস করে কিন্তু অশ্ব এলো কোথা হতে।

সে জীপ গাড়ি থেকে নেমে দুজন সঙ্গীসহ এগিয়ে চললো। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র।

বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর দেখতে পেলো মিঃ লিংকো, অদূরে একটি ঝোঁপের পাশে ঘুমিয়ে আছে একটি তরুণ।

মিঃ লিংকো হাত দিয়ে সঙ্গীদের বারণ করলো অগ্রসর হতে।

একজন সঙ্গীর হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে লাগলো, এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তরুণটির পরনে একটি প্যান্ট ছাড়া দেহে আর কোনো বস্ত্র নেই। প্যান্টখানাও ছেঁড়া মনে হচ্ছে।

মিঃ লিংকো বললো–তোমরা ওকে দূর থেকে লক্ষ করো। ও যেন বুঝতে না পারে। হয়তো কিছু সময়ের মধ্যেই ও জেগে উঠবে।

মিঃ লিংকোর উদ্দেশ্য কে এই তরুণ তার সন্ধান নেওয়া এবং তার বিষয়ে জানা।

একটা গাছের আড়ালে বসে পড়লো মিঃ লিংকো, তার হাতে বাইনোকুলার। সঙ্গীদের নির্দেশ দিলো তারা তাদের কাজ করে যাক।

ওদের বিদায় করে দিয়ে মিঃ লিংকো বাইনোকুলার চোখে লাগালো।

পাশ ফিরলো তরুণটি!

মিঃ লিংকো অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেলো।

নিদ্রাভঙ্গ হলো তরুণের। তরুণটি অন্য কেউ নয়–জাভেদ। যে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, বনের ফল ভক্ষণ করে। নদীতে সাঁতার কাটে কখনও বা তার অশ্ব জাম্বুর পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ায়।

মিঃ লিংকো দেখলো তরুণটি উঠে বসেছে।

হাই তুলে তাকালো সে চারদিকে।

মিঃ লিংকোর হাতে বাইনোকুলার, সে বার বার বাইনোকুলারটি চোখে লাগিয়ে দেখছে। তরুণটির বয়স কম হলেও তার দেহ শক্তিশালী এবং চেহারা সুন্দর সুঠাম। তার মনে প্রশ্ন কে এই তরুণ যে গহন বনে লুকিয়ে থাকে। তবে কি কোনো অপরাধী। হয়তো তাই হবে না হলে সে এমনভাবে গহন বনে লুকিয়ে থাকবে কেন মিঃ লিংকো গভীরভাবে ভাবতে থাকে।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে জাভেদ।

দুহাতের আংগুলে চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে নিয়ে অগ্রসর হয় অশ্ব জাম্বুর দিকে।

মিঃ লিংকো তার গলায় ঝোলানো ক্যামেরায় ছবি উঠিয়ে নিলো পরপর কয়েকটি।

তারপর মিঃ লিংকো দলবল নিয়ে ফিরে এলো নাতাশা শহরে। নাতাশা নিশাগো রাজ্যের একটি নামকরা শহর।

মিঃ লিংকো এই নাতাশা শহরের বাসীন্দা এবং ব্যবসায়িও বটে। হিংস্র জীবজন্তু পাকড়াও করে বিদেশে চালান দেওয়াই হলো তার কোম্পানীর কাজ। মিঃ লিংকো ফিরে এসে তার দলের নিকটে ফটোগুলো বের করল এবং বললো– এই তরুণ কে আমরা নাতাশার গভীর জংগলে আবিষ্কার করেছি। এর পরিচয় আমরা জানিনা, কে সে আর কি করেই বা জংগলে এলো।

চললো এই অদ্ভুত তরুণটিকে নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা। এমনকি কথাটা নাতাশা পুলিশ বাহিনীর কানেও গেলো এবং তারাও এ ব্যাপারে বিপুল আগ্রহ দেখাল। মিঃ লিংকো পুলিশ বাহিনীর দলে যোগ দিয়ে পুনরায় নাতাশা জংগলে প্রবেশ করল।

জাভেদ এ জংগলে নিশ্চিন্ত ছিল।

কেউ তার কাজে বাধা দিতনা। ক্ষুধা পেলে বনের ফল খেত, পিপাসা পেলে নদীর পানি পান করতো। গরম বোধ করলো নদী বা ঝর্ণার পানিতে স্নান করতো, আবার যখন তখন জাম্বুর পিঠে বনভূমি পেরিয়ে প্রান্তর আর পর্বত কিছুই সে বাকি রাখতোনা।

এহেন জাভেদকে এক স্থানে পাওয়া যাবে না এটা তারা জানতোনা।

মিঃ লিংকো নাতাশার পুলিশবাহিনীসহ জংগলে অনেক সন্ধান করে ফিরল কিন্তু জাভেদকে খুঁজে পেল না। তবু মিঃ লিংকোর সন্ধান–কাজ ব্যাহত রইল।

আবার সে সন্ধান পেলো।

কিন্তু জাভেদের নয় তার অশ্বখুরের।

বনভূমি পেরিয়ে প্রান্তরের নরম মাটিতে অশ্ব খুরের দাগ। সোজা সে দাগ চলে গেছে পর্বত অভিমুখে।

মিঃ লিংকো দলবল নিয়ে অশ্ব পদচিহ্ন লক্ষ করে অগ্রসর হলো। জীপ চালিয়ে চললো। সঙ্গে ওয়্যারলেস মেশিন এবং বাইনোকুলার। এ ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল।

পুলিশমহল অপেক্ষা করতে লাগলো জঙ্গলের কাছাকাছি একটি জায়গায়। তবু গেঁড়ে বিশ্রাম করছেন নাতাশা পুলিশ সুপার মিঃ ম্যাকলোনা। তার তাঁবুতে রয়েছে ওয়্যারলেস এবং অস্ত্রশস্ত্র। তাদের ধারণা এই তরুণ কোনো পলাতক আসামী। নইলে সে এমনভাবে গা ঢাকা দিয়ে বনাঞ্চলে থাকতো না।

পুলিশ সুপার তাই মিঃ লিংকোর সাহায্য কামনা করে তার সঙ্গে নাতাশা জঙ্গলে এসেছেন। ছবি দেখে বিপুল আগ্রহ জেগেছে তার মনে, কে এই তরুণ?

মিঃ লিংকো তার জীপখানা নিয়ে অশ্বপদ চিহ্ন লক্ষ করে পর্বত অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

পর্বতমালার কাছাকাছি জীপখানা এসে পড়েছে ঠিক ঐ সময় মিঃ লিংকোর বাইনোকুলারে ধরা পড়লো দূরে বহুদূরে অশ্বপৃষ্ঠে এক ব্যক্তি উঁচু পর্বতের ঢালু জায়গা দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। বাইনোকুলারে স্পষ্ট ধরা পড়লো সেই ব্যক্তি ঐ তরুণ।

মিঃ লিংকো ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিলে পুলিশবাহিনীকে, সন্ধান পাওয়া গেছে।

পুলিশবাহিনী তাদের জীপ রেখে অশ্বপৃষ্ঠে পর্বতমালা লক্ষ করে এগিয়ে চললো।

কিন্তু জাভেদকে পাকড়াও করা তাদের সাধ্যের বাইরে।

কিছুতেই মিঃ লিংকো ও নাতাশা পুলিশবাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলো না।

জাভেদ বনাঞ্চলে আত্মগোপন করে রইলো। মাঝে মাঝে সে নাতাশা শহরের আশেপাশে বেরিয়ে আসতো। গভীর রাতে তাকে দেখা যেতো, শোনা যেতো তার অশ্বখুরের শব্দ।

নাতাশা পুলিশবাহিনী এবং জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। না জানি কি উদ্দেশ্য তার কে জানে।

নাতাশাবাসিগণ এই অজ্ঞাত পরিচয় তরুণকে নিয়ে সব সময় আলাপ–আলোচনা করতে লাগলো। পথচারিগণ প্রায়ই এই তরুণের দেখা পায়। কখনও প্রান্তরে অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও গভীর জঙ্গলের ধারে, কখনও বা পর্বতমালার নিকটে। কিন্তু কেউ তাকে পাকড়াও করতে পারে না।

অশ্ব জাম্বুর পিঠে উলকার মত ছুটে বেড়ায় জাভেদ।

নাতাশার পত্রপত্রিকায় বের হলো তার ছবি।

জাভেদকে নিয়ে নাতাশাবাসীর মধ্যে ভীষণ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

জাভেদ তখন নাতাশা জঙ্গল ত্যাগ করে চলেছে, কোথায় চলেছে কে জানে।

অশ্বপদ শব্দে চমকে উঠলো আশা।

হুমায়রা তখন বনফুল নিয়ে মালা তৈরি করছিলো।

বললো আশা–হুমায়রা, বল দেখি এ অশ্বপদ শব্দ কার অশ্বের?

বললো হুমায়রা–বনহুরের।

না।

তবে কার অশ্ব এই নির্জন বনভূমি অতিক্রম করে আমাদের আবাসভূমির দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি জানি।

সত্যি তুমি জানো আশা দিদি?

জানি। যাকে বনহুর খুঁজে ফিরছে, যাকে তুমি কামনা করছো সেই ইন্দ্রনাথ......

সত্যি! কথাটা বলে ছোট্ট শিশুর মত হুমায়রা জড়িয়ে ধরলো আশার গলা।

হুমায়রা দীর্ঘ সময় আশার কাছে রয়েছে।

আশার কাছে সে মনের কথা ব্যক্ত করেছে। এমন কি সন্ন্যাসী বাবা এবং ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সব কথা বলেছে সে।

আশা বনহুরের মুখে শুনেছিলো সব কিছু। তখনই সে ইন্দ্রনাথের আসল পরিচয়ও জেনেছিলো। হুমায়রা যে ইন্দ্রনাথকে ভালবাসে তাও বলেছিলো বনহুর অকপটে আশার কাছে।

আশা মনে মনে খুশিই হয়েছিলো সেদিন। তারপর আশা হুমায়রার কথার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলো তার অন্তরের কথা। জানতে পেরেছিলো সবকিছু।

হুমায়রার মনের ব্যথা আশা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে। আজ যখন আশার কানে জাম্বুর পদশব্দ অতি পরিচিত লাগলো।

কিন্তু অশ্বপদ শব্দ ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে মনে হলো। আশার মুখমন্ডল ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এলো।

বললো হুমায়রা–কি হলো?

যা ভেবেছিলাম তা নয় হুমায়রা। যে অশ্বপদ শব্দ শুনে মন আমার আনন্দে ভরে উঠেছিলো, এ অশ্বপদ শব্দ তার নয়। আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু ফোঁটা অশ্রু জানিস হুমায়রা, তোর ইন্দ্রনাথ অন্য কেউ নয়, বনহুরের পুত্র জাভেদ……

এ তুমি কি বলছো আশা দিদি।

হাঁ, যা সত্য তাই বলছি। বনহুর আমাকে সব কথা বলেছে, আরও বলেছে তুই এ জানিস না।

তবে যে ইন্দ্রনাথ ওকে……বুঝেছি, সন্ন্যাসীর ওষুধের ক্রিয়া…..

হাঁ, তাও শুনেছি। জাভেদ বনহুরকে মোটেই চিনতে পারেনি এবং সে কারণেই জাভেদ তাকে শত্রু মনে করেছে এবং হত্যা করার জন্যও উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো।

তোমার কথা বিশ্বাস না করে পারছি না, কারণ আমি ইন্দ্রনাথের চেহারায় এবং তার আচরণে বনহুরের প্রতি ছায়া দেখতে পেতাম। বহুবার ভেবেছি ইন্দ্রনাথ আর বনহুরের মধ্যে এতমিল কেন? কিন্তু সাহস হয়নি বনহুর বা ইন্দ্রকে এ কথা জিজ্ঞাসা করার। একটু থেমে বললো হুমায়রা জানিনা সে বেঁচে আছে না মরে গেছে....

না না, তোর ইন্দ্র মরেনি–মরতে পারে না, কারণ সে কোনো দোষে দোষী নয়, সে নিষ্পাপ পবিত্র।

আশা দিদি, তার এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী আমি। আমি তাকে নিজ হাতে......আর বলবো না। আর বলতে পারবো না আমি আশা দিদি। কথাগুলো বলে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো হুমায়রা।

সব জানি, সব বুঝি। তোর মতই তো আমার বুকে ব্যথার জ্বালা। আমিও ভালবেসেছিলাম বনহুরকে। অন্তর দিয়ে কামনা করেছিলাম ওকে পাবো কিন্তু আমি পরাজিত......আমি হেরে গেছি......ওর কাছে আমি হেরে গেছি হুমায়রা।

হুমায়রা নির্বাক পুতুলের মত তাকিয়ে থাকে, কোনো কথা বলেনা, বলতে পারে না। নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে আশার মনের ব্যথা। ইন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার পর সে ভালবেসে ফেলেছিলো। তার প্রতিচ্ছবি রেখাপাত করেছিলো হুমায়রার মনে। সন্ন্যাসী বাবার নির্দেশ পালন না করে উপায় ছিলো না, তাই সে ঐ সুধা পান করতে দিয়েছিলো ওকে, যা বিষের চেয়েও মারাত্মক।

কি ভাবছিস হুমায়রা?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো হুমায়রা–না, কিছু না।

আমার কাছে লুকোতে পারবি না; আমি সব বুঝি সব জানি, তাই তো আমি তোকে আমার কাছে আশ্রয় দিয়েছি কিন্তু......

বলো আশা দিদি, থামলে কেন?

ওকি আর ফিরে আসবে। আর যদি আসে তাহলে ওকে যে আর একজন ভালবাসে।

এ তুমি কি বলছো আশা দিদি!

হাঁ সত্যি।

বলো? বলল যা জানো বলো আমার কাছে?

হুমায়রার ব্যাকুল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আশার মুখ মলিন হয়ে গেলো। তবুও না বলে সে পারলো না, বললো–ফুল্লরা বলে তার ছোটবেলার সাথী একটি মেয়ে তাকে ভালবাসে। শুধু ভালবাসা নয়, নিজের জীবন দিয়েও সে তাকে পেতে চায়। কিন্তু জাভেদ কোনোদিন তার প্রেমে সাড়া দেয়নি।

আশার কথায় বুকটা ধক করে উঠলো হুমায়রার, একটা হাতুড়ির আঘাত যেন তার হৃৎপিন্ডটাকে প্রচন্ড আঘাতে ভেঙে চুরমার করে দিলো। কিন্তু যখন সে শুনলো জাভেদকে ফুল্লরা ভালবাসলেও জাভেদ তার প্রেমে সাড়া দেয়নি, তখন একটা অনাবিল আনন্দ তার সমস্ত মনের ওপর খুশির আবেশ ছড়িয়ে দিলো, উদ্ভাসিত করে তুললো হৃদয়টাকে। তাহলে জাভেদ সেই ফুল্লরা নামের মেয়েটির প্রেম–ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ–হয়নি।

হুমায়রা আপন মনে ভেবে চলছে। ইন্দ্রনাথকে সে আর কোনোদিন ফিরে পাবে কিনা জানে না। জানে না সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। আর কোনোদিন চোখের দেখাও দেখবে কি না তাও

জানে না, তবুও বড় খুশি লাগছে হুমায়রার জাভেদ পবিত্র নির্মল নিষ্পাপ। কথাটা ভাবতেও যেন ভাল লাগছে হুমায়রার।

আশা কিন্তু বলেই চলেছে–আশ্চর্য জাভেদ। বনহুরের কিছুই বাদ যায়নি তার মধ্যে। সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাসি, সেই চোখমুখ...সত্যি বড় অদ্ভুত...কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো আশা–হুমায়রা, জানি না তোর বাসনা পূর্ণ হবে কি না।

হুমায়রার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

বললো–অমন কথা বলো না আশা দিদি। আমি ভাবতেও পারি না সে কোনো দিন ফিরে আসবে না। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর।

আশা হুমায়রার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বললো হুমায়রা–তুমি আশীর্বাদ করো আশা দিদি। আমি সব হারাতে পারি কিন্তু আমার ইন্দ্রকে হারাতে পারি না।

হুমায়রার কথায় আশা আনমনা হয়ে যায়। দৃষ্টি চলে যায় দূরে সীমাহীন আকাশের ও প্রান্তে। আশার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটি শব্দ–হুমায়রা, যা কামনা করা যায় তা পাওয়া যায় না। যেমন আকাশের চাঁদ বড় প্রিয় কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়া যায়? আমিও তোর মত চেয়েছিলাম ওকে কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা নয়। তবুও আমি আশীর্বাদ করি তোর বাসনা যেন পূর্ণ হয়।

হুমায়রা বলে—-আশা দিদি, তুমি মিছেমিছি দুঃখ করছো। বনহুর তোমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে। সে তো তোমাকে অবহেলা করে না।

ওকে কেউ চিনতে পারে না বুঝতে পারে না। বনহুর এক অদ্ভুত মানুষ। আলেয়ার আলো যেমন চোখে দেখা যায়, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না তেমনি একটা মানুষ।

হুমায়রা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যায়, সে নিজেও বনহুরকে দেখেছে। অনেক কথা হয়েছে তার সঙ্গে, কিন্তু তাকে বুঝতে পারেনি জানতে পারেনি। অতি নিকটে থেকেও বহু দূরের মানুষ বলে মনে হয়েছে। সব যেন কেমন স্বপ্নময় মনে হয় হুমায়রার কাছে।

ইলোরা বনহুরের শিয়রে বসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। আজ বনহুর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এ কদিন তার উপরে নানা রকম ঝামেলা গিয়েছে। সর্বক্ষণ তাকে জেগে কাটাতে হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না বনহুর ডুবুজাহাজের চালকদেরকে। তারা ঠিকপথে চলেছে কিনা এবং ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কিনা সব বনহুর নিজে ওদের পাশে থেকে লক্ষ করে। এ ছাড়া জাহাজের অভ্যন্তরে নানা ধরনের মেশিন এবং যন্ত্র রয়েছে এগুলো বনহুর একটির পর একটি পরীক্ষা করে দেখছে যদি কোনোটা তার কাজে এসে যায়।

ডুবু জাহাজের খোলের ভিতরে নানা ধরনের মেশিনকক্ষ ছিলো, কোন্ ক্যাবিনে কি ধরনের এবং কোন কাজের মেশিন রয়েছে তা এ জাহাজে বাস করেও অনেকেই জানতোনা, যেমন ইলোরা ও তার দলের একটি তরুণীকেও হামবার্ড জানতে দেয়নি সবকিছু।

বনহুর একদিন আবিষ্কার করলো ডুবুজাহাজের চোরা এক ক্যাবিনে কিছু ভয়ংকর ও বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ। গভীরভাবে বনহুর পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো হামবার্ড শুধু দস্যুতাই করতোনা সে কোনো মারাত্মক অস্ত্র তৈরির আয়োজনও করছিলো। বনহুরের আরও সন্দেহ জাগলো, হামবার্ড যে অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছিলো তা সাধারণ অস্ত্র নয়। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো অস্ত্র হবে।

কদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে সব অনুধাবন করার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে বনহুর, হঠাৎ তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিন্তিত হয় ইলোরা। যদিও জাহাজে ওষুধপত্র সবকিছু আছে তবুও ইলোরার মনে শান্তি নেই। কারণ বনহুরের শরীর বড্ড অসুস্থ।

ইলোরা নিজে সেবাযত্ন করে চলেছে।

তারপর আছে আহত যাত্রীদের শুশ্রূষা করা, পথ্যাপথ্য খাওয়ানো, আরও অনেক কাজ।

হঠাৎ বনহুর অসুস্থ হয়ে পড়ায় সবচেয়ে বেশি ব্যথিত হলো ইলোরা, কারণ সে জানে ওর। জন্যই আজ তারা উদ্ধার পেতে চলেছে। আর দুএক দিনের মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে নিকটতম কোনো এক বন্দরে। কিন্তু সে আনন্দ কেমন যেন নিরানন্দময় মনে হচ্ছে ইলোরার কাছে। বনহুর কি তাদের পৃথিবীর আলোবাতাসে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নেবে? তাহলে কি বনহুরের সঙ্গে তাদের সব সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে।

বনহুরের মুদিত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ইলোরা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে যায়। বনহুরকে হারানোর কথা যেন ইলোরা ভাবতেই পারে না। কদিনের আলাপ ওর সঙ্গে তাই সে এত অভিভূত হয়ে পড়েছে। ইলোরা ভেবে চলে সত্যি সে ওকে ছাড়া বাঁচবে না…না না, এসব কি ভাবছে ইলোরা, যা হবার নয় তা নিয়ে কেন তার এত ভাবনা। বনহুর তো বিবাহিত, তার জীবন বৈচিত্রময়। তাকে কি ধরে রাখতে পারবে ইলোরা? ইলোরার মনে সব কথা ভেসে ওঠে। বনহুর এ জাহাজে আসার পর তার সঙ্গে বনহুরের আচরণ, তার কথাবার্তা, তার কার্যকলাপ কোথাও কি ছলনা আছে? না, বনহুর ছলনা জানে না, তার আচরণ সত্য এবং বলিষ্ঠ। তবে কি বনহুও তাকে ভালবেসে ফেলেছে? বনহুর তো তার সঙ্গে কোনো মন্দ আচরণ করেনি বা তার আচরণে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি……

বনহুর চোখ মেলে বলে–ইলোরা, সত্যি তোমার সেবাযত্নের প্রশংসা না করে পারছি না।

তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো এটাই আমার কামনা। তোমার অসুখ আমাকে বিচলিত করেছে।

আমাকে নিয়ে তুমি ভাবো এ আমি চাই না ইলোরা, আমার কিছু হয়নি, এই তো সেরে যাবো দুএক দিনের মধ্যে। তা ছাড়া আমরা অচিরে পৌঁছে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যস্থানে। তোমার খুব খুশি লাগছে, না ইলোরা?

না। খুশি লাগছে না।

কেন?

তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

না বললে আমি বুঝবো কেমন করে?

বনহুর, তোমার কি একটুও বোঝার ক্ষমতা নেই......ইলোরার কণ্ঠ কেমন যেন কান্নাভেজা মনে হয়।

তাকায় বনহুর ওর মুখের দিকে।

বনহুর একটু হেসে বলে–সত্যি মেয়েরা বড় অভিমানিনী হয়। একটুতেই বড় ব্যথা পায়। আমি জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে......

আমার কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি অসহায়–নিঃস্ব। ফিরে গেলেও আমাকে সমাজ গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ।

ইলোরা, তুমি বিবাহিত নও। তোমার বাবা মা আত্মীয়–স্বজন এরা তোমাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না।

তুমি জানো না বনহুর সমাজ কতখানি কঠিন, কত

জানি এবং শুধু তুমি নও, তোমার মত অনেক মেয়েকে আমি হয় তার পিতামাতা, নয় তো স্বামীর হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। নিজের দোষে নয়–

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ তোমাদের এই অবস্থা। এর জন্য দায়ী তুমি বা তোমরা নও.....

কিন্তু......।

কোনো কিন্তু নয়। ইলোরা, ইলোরা, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকবে আমি তোমাদের ব্যবস্থা করে দেবো।

যদি আব্বু আম্মু আমাকে গ্রহণ না করেন?

বলেছি তো কিছু ভেবো না.....

এমন সময় ক্যাবিনের সাউন্ড বক্সে চালকদের একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো......আমাদের ডুবুজাহাজ ইনোশা বন্দরের কাছাকাছি এসে গেছে...... আমরা ডুবুজাহাজটি এখন স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে দেবো......

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে চালকদের ক্যাবিনে গিয়ে ঢুকলো। সামনে মিটারযন্ত্রে দেখালো সত্যি তাদের ডুবুজাহাজখানা ইনোশা বন্দরের অতি কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বনহুরের চোখ দুটো খুশিতে জ্বলে উঠলো। তাকে দেখে মনে হলো এতটুকু অসুস্থতা নেই তার মধ্যে। সব ক্লান্তি অবসাদ কেটে গেছে।

ছুটে গেলো বনহুর ইলোরার ক্যাবিনে।

ওর হাত দুখানা ধরে বললো–ইলোরা, তোমার কষ্ট সার্থক হয়েছে।

ইলোরার মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

বনহুর তেমনি দীপ্তকণ্ঠে বললো—-আমরা এবার পৃথিবীর মাটিতে পা রাখতে পারবো। তোমার খুশি লাগছে না?

না।

বলো কি ইলোরা?

হাঁ, আমার ভাল লাগছে না।

আশ্চর্য মেয়ে তুমি ইলোরা……ওকি, তোমার চোখে পানি! তুমি কাঁদছে ইলোরা? কি হলো। তোমার?

তুমি বুঝবে না।

বলো ইলোরা কি হয়েছে, খুলে বল?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ইলোরা–আমি জানতাম তুমি অত্যন্ত হৃদয়বান পুরুষ, কিন্তু……

বলো থামলে কেন?

তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই। যদি তুমি বুঝতে, আমার মনের কথা তাহলে অমন করে কথা বলতে পারতে না।

ইলোরা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা?

আমি বলতে চাই না কিছু।

বলতে না চাইলেও বলতে হবে। বলো ইলোরা, তুমি কেন খুশি হতে পারোনি, আমরা পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে সক্ষম হবো তবু তুমি……

না, আমি খুশি নই। তুমি কি আজও বুঝতে পারছে না আমার অন্তরের কথা? বনহুর, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। পৃথিবীর আলো–বাতাস তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে……আমি তাই পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই না।

ইলোরা!

হাঁ বনহুর। এ তুমি কি বলছো ইলোর?

যা আমার অন্তরের কথা তাই বলছি। বনহুর, আমি তো কোনো পাপ করিনি। তোমাকে ভালবেসে আমার হারানো জীবন পেয়েছি।

ইলোরা!

তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে, এ আমি সইতে পারবো না। আমি জানি তোমাকে অনেকে ভালবেসেছিলো কিন্তু তারা তোমার ভালবাসা পেতে ব্যর্থ হয়েছে–জানি আমিও তোমাকে পাবো না, তবু সান্ত্বনা তোমার সান্নিধ্য আমার মনের সমস্ত যন্ত্রণাকে ধুয়েমুছে প্রশান্তির পবিত্রতায়। দীপ্তময় করে তুলেছে। ইনোশা আমার সব শান্তি কেড়ে নেবো। আমি হারাবো তোমাকে।

বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে ইলোরার মুখের দিকে।

*

তারপর আসে ইনোশা বন্দর।

ডুবুজাহাজখানা ভেসে ওঠে মাঝসমুদ্রে।

অনেকগুলো রবার বোট বের করা হয় ডুবুজাহাজ থেকে। ভাসানো হয় সমুদ্রে, তারপর আহত যাত্রীদের সবাইকে নিয়ে আসা হয় ইনোশা বন্দরে।

ইনোশার পুলিশপ্রধান এগিয়ে আসেন বনহুরকে সাহায্য করতে।

বনহুর এক বিদেশী ডিটেকটিভ বলে নিজের পরিচয় দেয় এবং কি ভাবে জলদস্যু হামবার্ডকে হত্যা করে তার ডুবুজাহাজের বহু বন্দী নারী এবং পুরুষকে উদ্ধার করে তাও বর্ণনা করে সে।

জলদস্যু হামবার্ডের অনুচরদের হাতে আহত ব্যক্তিদের ইনোশা হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তারপর বনহুর নির্যাতিত তরুণীদের সবাইকে যার যার ঠিকানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা

শুধু রইলো ইলোরা।

তাকে কিছুতেই বনহুর তার ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারছে না।

এক কথা ইলোরার–সে তার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যেতে চায় না। বনহুর যেখানে সে থাকতে চায় এখানে।

বললো বনহুর–তা কি হয়! তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হতে পারে না ইলোরা।

তোমার সঙ্গ আমাকে নতুন জীবন দান করেছে, আমি তোমাকে ছাড়া বাচবো না। ইলোরা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

ইলোরার দুচোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। গন্ডদ্বয় রক্তিম আভা ধারণ করে।

হেসে বলে বনহুর–তুমি বড় পাগল। জানো না আমি কখন কোথায় থাকি তার কোনো ঠিক নেই, তাছাড়া আমার জীবন সঙ্গীহীন......

বনহুর, জানি তুমি এই ডুবুজাহাজ নিয়ে সাগরের অতলে আবার তলিয়ে যাবে। নতুন সন্ধান চালাবে তুমি ডুবুজাহাজ নিয়ে....

কে তোমাকে এসব বলেছে?

আমি তোমার মনের কথা বলতে পারি। তোমার দুচোখ আমাকে ইংগিত করেছে। তোমার কার্যকলাপে আমি বুঝতে পেরেছি।

ইলোরা!

হাঁ, আমি জানি তুমি এ জাহাজ সহজে ত্যাগ করবে না। একটু থেমে বললো ইলোরা–বনহুর, তোমার সঙ্গে আমাকে থাকতে দাও, আমি তোমার উপকারে আসবো। ঐ ডুবুজাহাজের অনেক কিছুই তুমি জানো না যা আমি জানি!

ইলোরা, তাহলে বলোনি কেন এতদিন?

আমি জানতাম তুমি অসাধারণ এবং তোমার কাজকর্মও বিস্ময়কর, তুমি সব সময় জাহাজটির অভ্যন্তরে সন্ধান চালিয়ে চলেছে তাও আমি লক্ষ করেছি। তখন বলিনি, কারণ বলবার সময় তখন আসেনি।

বনহুর ইলোরার কথাগুলো মানোযোগ সহকারে শুনছিলো। ইলোরা যে এত জানে তা সে। ভাবতে পারেনি এবং সে জন্যই বনহুর ওকে তেমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি কোনোদিন। ইলোরার কথাগুলো বনহুরের মনে চিন্তারেখা টানে। সত্যি বনহুর ডুবুজাহাজ নিয়ে সন্ধান চালাবে, হামবার্ড ডুবুজাহাজখানা নিয়ে শুধু দস্যুতাই করতো না, এমন কোনো কাজের সঙ্গে সে জড়িত ছিলো যা সে পৃথিবীর

মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। মণীষা দ্বীপের ওপর যে প্রচন্ড সাইক্লোন বয়ে গেছে তা প্রকৃতির ঝড় বা জলোস নয়, এর পেছনে রয়েছে কোনো গভীর রহস্য.......

বনহুর ইনোশা বন্দরের একটি হোটেল বেছে নিয়েছিলো কদিনের জন্য। এখানে বসেই সে ডুবুজাহাজের চালকদের সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বলতে এবং বিভিন্ন কাজ সমাধা করে নিচ্ছিলো। আহত যাত্রীদের ইনোশা হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে নিজেও মাঝেমধ্যে গিয়ে দেখাশোনা করতো ঠিকভাবে তাদের সেবা যত্ন এবং চিকিৎসা হচ্ছে কিনা।

ইলোরা থাকতো বনহুরের সঙ্গে।

ইলোরার সঙ্গীতরুণীদের নিজ নিজ ঠিকানায় বিমানযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন বনহুর অনেকটা নিশ্চিন্ত। এবার সে ভাবছে তার কাজের কথা। ইলোরা পাশের ক্যাবিনে থাকে, ওকে বনহুর তার বাবা মার কাছে পাঠাতে চায় কিন্তু সে ফিরে যেতে চায় না।

হাসে বনহুর, ইলোরা বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা অথচ সে বড় সরল। বনহুরকে ভালবেসে তার কোনো ফল হবে না, কত মেয়েই না তাকে ভালবেসেছে কিন্তু তারা সবাই ব্যথা আর বেদনা ছাড়া। কি পেয়েছে?

বনহুর সিগারেট পান করছিলো আর গভীরভাবে চিন্তা করছিলো ইনোশায় তার যা কাজ ছিলো শেষ হয়েছে, এবার তাকে বিদায় নিতে হবে। ইলোরা যা ভেবেছে তাই, ডুবুজাহাজ নিয়ে আবার সে তলিয়ে যাবে গভীর জলের অতলে। কিন্তু ইলোরা সে যে কিছুতেই তার সঙ্গ ত্যাগ করতে চায় না। বড় খেয়ালী মেয়েটা, ওকে কোনোমতেই দেশে পাঠানো সম্ভব হলো না। নাছোড়বান্দা একেবারে ইলোরা। ডুবু জাহাজের অনেক কিছুর সন্ধান সে জানে যা বনহুর জানে না। হয়তো বা ওর কাছে অনেক কিছু গোপন তথ্য রয়ে গেছে, হয়তো অনেক কিছু সাহায্য পাবে বনহুর। তবে কি ইলোরাকে সে পুনরায় ঐ ডুবো জাহাজে সঙ্গী করে নেবে....

কি ভাবছো বনহুর?

কে ইলোরা?

হাঁ

বসো।

কি স্থির করলে?

ইনোশার কাজ তো শেষ হলো। আহত যাত্রীদের সবাই প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাদের পরিচয় নিয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

তাহলে তো তোমার ছুটি কি বলে?

ঠিক ছুটি নয় তবে ইনোশা থেকে বিদায় নেবো।

আমার কথাগুলো ভেবেছো?

মনে করছি তোমার প্রয়োজন আছে,

সত্যি?

ইলোরা, তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে।

বনহুর লক্ষ করলো ইলোরার মুখমন্ডল দীপ্তময় হয়ে উঠেছে। একটা অজ্ঞাত খুশির আভাস ভেসে উঠলো তার দুচোখে।

বনহুর একটু হেসে বললো–ইলোরা, ঐ ডুবু জাহাজে আবার তোমার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়? তোমার জীবনের এক অভিশাপ জড়িয়ে রয়েছে ঐ ডুবু জাহাজে তবুও……

তুমি যেখানে থাকবে আমি থাকবো তোমার পাশে। তোমাকে পাশে পেলে আমি যমালয়ে যেতেও পিছপা হবে না।

ইলোরা, নারীজাতির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, তারা নিজের জীবন দিয়ে ভালবাসার প্রতিদান দিয়ে যায়। তুমি নারী তাই তোমার ওপর আমার সে বিশ্বাস অটুট।

তাহলে তুমি আমাকে বঞ্চিত করোনা তোমার সঙ্গ থেকে?

বেশ তাই হবে, কিন্তু শুধু ব্যথা আর কষ্টই পাবে....বনহুর কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো।

*

ইলোরা সহ আবার সেই ডুবুজাহাজ।

চালক তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই তাদের সঙ্গী।

বনহুর আর ইলোরা।

ভাবে বনহুর ইলোরা না থাকলে হয়তো হাঁপিয়ে উঠতে সে। কথা বলবার সঙ্গীও তার ছিলো না। চারদিকে শুধু যন্ত্রদানব, ডুবু জাহাজখানা একটি যন্ত্রের কারখানা যেন।

বনহুর সব সময় এইসব যন্ত্র আর মেশিনপত্র নিয়ে গবেষণা চালায়, ইলোরা তাকে সাহায্য করে।

লক্ষ্য করেছে বনহুর, ইলোরা এমন অনেক কিছু জানে যা তার জানার বাইরে ছিল।

ইলোরা বলেছে, এ জাহাজে এমন একটি ক্যাবিন আছে যে ক্যাবিনে রয়েছে মারণাস্ত্র তৈরির নানাবিধ সরঞ্জাম। সেই মারণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করা যাবে একটি মহাদেশ, যেমন হিরোসিমা নাগাসাকি ধ্বংস করা হয়েছিলো।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই বীভৎস ভয়ংকর দৃশ্য, যা ঘটেছিলো হিরোসিমা নাগাসাকিতে। আজও সেখানে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে তারা পঙ্গু অথবা অন্ধ হয়ে জন্ম নেয়। এখানে এখনও সবুজ ঘাস জন্মায় না, ধূসর রঙের পাতাগুলো খসখসে মনে হয়। তরুণীদের মাথায় চুল নেই, চোখের পাতা লোমহীন, কেমন যেন ঘোলাটে চেহারা। নাক মুখ এবড়ো থেবড়ো। হাত পা লুলো– বড় অসহায় ওরা।

কি ভাবছো বনহুর?

হিরোসিমা নাগাসাকীর কথা ভাবছি। হামবার্ড তাহলে শুধু দস্যুতাই করে ক্ষান্ত ছিলো না সে এমন এক অস্ত্র বের করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো যা দিয়ে সে সমস্ত পৃথিবীটা ধ্বংস করে দেবে।

ঠিক কথা বলেছ বনহুর।

ইলোরা, তুমি এ সন্ধান না দিলে আমি পেতাম না। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তোমাকে সহযোগিতা করতে পারবো বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি এখন। বনহুর, শুধু হামবার্ড একাই এ চেষ্টা নেয়নি তাকে সাহায্য করেছে ইনোশার এক বৈজ্ঞানিক যার বয়স আশির উর্ধ্বে।

কি নাম তার?

নাম জানি না তবে জানি সে এই ডুবু জাহাজের কোনো এক গোপন ক্যাবিনে বসে এই ভয়ংকর মারণাস্ত্র তৈরির গবেষণা চালিয়ে চলেছিলো।

সে কি এখনও এই ডুবু জাহাজে আছে?

না।

তবে কোথায় সে?

তাকে মণীষা দ্বীপের কোনো এক নিভৃত স্থানে ভূগর্ভে রাখা হয়েছে। কেউ যেন তার সন্ধান না পায় এজন্য হামবার্ডের চিন্তার অবধি ছিলো না।

সত্যি?

হাঁ বনহুর।

এতদিন আমাকে এসব কথা বলনি কেন?

ভেবেছিলাম তোমাকে এসবের মধ্যে জড়াবো না।

কেন?

তোমার জীবনে বিপদ নেমে আসুক এ আমি চাই না, আর চাই না বলেই বলিনি এ কথা।

তুমি জানো না ইলোরা, আমার স্বভাব বিপদ নিয়ে খেলা করা। যা আমার মা, আমার স্ত্রী পারেনি রুখতে।

সত্যি তুমি বড় এক গুয়ে।

নাহলে পারতাম না জলদস্যু হামবার্ডকে পরপারে পাঠাতে। তবে মায়ের দোয়া আছে যা আমাকে সদাসর্বদা ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করে চলেছে।

তোমার মা আছেন বনহুর?

আছেন এবং তার স্নেহ আমাকে বারবার হাতছানি দেয়। আর সেই আকর্ষণে আমি ফিরে যাই কান্দাই শহরে.....ইলোরা, মাকে শ্রদ্ধা করি ভালবাসি বলেই নারীজাতির প্রতি আমার এত দুর্বলতা। নারীজাতির প্রতি কোনো সময় আমি বিরুপ নই। তাদের শত অপরাধ আমাকে বিচলিত করে না, আমি হয়ে পড়ি ক্ষমাশীল।

তুমি যে কথা বলো তা যেন অপূর্ব, কোনো মহামানবের বাণী। তোমার কণ্ঠস্বরে কি যাদু আছে যা আমাকে শুধু বিমুগ্ধ করেনি, করেছে হতবাক।

ইলোরা, তোমার গুণগুলো আমাকে অভিভূত করেছে। তোমার সঙ্গ না পেলে হয়তো এ কাজ করা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হতো। তুমি আমার এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী......তোমার সাহায্য আমার দরকার ছিলো।

ইলোরার সহযোগিতায় বনহুর একদিন খুঁজে পেলো সেই গোপন ক্যাবিন, যা ডুবু জাহাজখানার অভ্যন্তরে গোপন স্থানে ছিলো।

হঠাৎ সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করে বনহুর আর ইলোরা ভীষণ চমকে উঠলো। একটি চেয়ারে বসে রয়েছে একটি পাথরের মূর্তিরমত রক্ত মাংসের মানুষ। মৃত না জীবিত বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুর ইলোরার হাত ধরে বললো–তুমি এখানে অপেক্ষা করো আমি আগে ক্যাবিনটার মধ্যে পরীক্ষা করে দেখে নিই।

ইলোরা দাঁড়িয়ে রইলো ক্যাবিনের দরজায়।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে সেই চেয়ারে বসা লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকলো বনহুর–হ্যালো, আপনি কে? কে আপনি?

কোনো জবাব নেই।

বনহুর লোকটার দেহ স্পর্শ করবে কিনা ভাবছে সেই মুহূর্তে ইলোরা বলে উঠলো–ওর দেহ স্পর্শ করো না বনহুর।

ফিরে তাকালো বনহুর ইলোরার দিকে।

ইলোরা বললো–ওটা মানুষ নয়, একটা নরদেহ।

ইলোরা!

হাঁ, আমি জানি। সব তোমাকে পরে বলবো।

সংক্ষেপে বলতে পারো হয়তো এতে আমার উপকার হবে।

জলদস্যু হামবার্ড আরাকান থেকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে বন্দী করে এনেছিলো, তাকে দিয়ে আণবিক বোমা মারণাস্ত্র তৈরি করবে। কামাবে কোটি কোটি টাকা। আমার মনে হয় এই সেই বৈজ্ঞানিক যাকে বন্দী করে আনা হয়েছিলো।

কিন্তু লোকটার মৃত্যু ঘটেছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

চলো আমিও দেখছি তোমার সঙ্গে।

না, ওকে স্পর্শ করা যাবে না। আমার মনে হয় ওর শরীরে কোনো মারাত্মক রশ্মি প্রবেশ করায় মৃত্যু ঘটেছে।

হাঁ, আমারও সেই রকম ধারণা হচ্ছে। মারণাস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে শেষে বৈজ্ঞানিক নিজেই। মৃত্যুবরণ করেছে।

বনহুর আরও নিকটে এগিয়ে গেলো।

ক্যাবিনটা বৃহৎ আকার, চারদিকে নানা ধরনের অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর বস্তু ছড়ানো রয়েছে।

যে চেয়ারে লোকটা বসেছিলো তার সম্মুখে টেবিল। টেবিলে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক আসবাবপত্র এবং নানা ধরনের যন্ত্র রয়েছে। বনহুর ভালভাবে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো লোকটা জীবন হারিয়েছে। একটা বস্তু দিয়ে শরীরে নাড়া দিতেই, লোকটার দেহ চেয়ার থেকে পড়ে গেলো এবং আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটলো।

লোকটার দেহ তরল পদার্থের মত মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ংকর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত ক্যাবিনটার মধ্যে।

বনহুর আর ইলোরা নাকে রুমাল চাপা দিলো।

ইলোরা বললো–বেরিয়ে এসো বনহুর, আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে মৃত্যু ঘটবে।

বনহুরের হাত ধরে এক রকম প্রায় টেনে বের করে নিয়ে এলো ইলোরা।

সত্যি এমন বিস্ময়কর ঘটনা এর পূর্বে তারা কেউ দেখেনি। একটা জীবন্ত মানুষ কেমন করে তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে।

ইলোরা আর বনহুর ফিরে এলো তাদের নিজের ক্যাবিনে।

তাদের মধ্যে আলোচনা চললো।

বললো বনহুর–জলদস্যু হামবার্ডের উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্বের ক্ষতি সাধন করা।

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। সে মণীষা দ্বীপের অভ্যন্তরে কোনো এক গোপন স্থানে তার এই মারণাস্ত্র তৈরির ঘাঁটি করেছে এবং ঐ মারণাস্ত্র তৈরির পর সাগরের গভীর অতলে বিস্ফোরণ ঘটায়। যার জন্য মণীষা দ্বীপবাসীদের জীবনে নেমে আসে এক মহাকাল রাত্রি…

বনহুরের কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো মিঃ আহাদ চৌধুরীর সেদিনের কথাগুলো। মণীষা দ্বীপের অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে কোনো গভীর

রহস্য। দস্যুরাণী তাহলে নিশ্চুপ নেই। সে হয়তো মিঃ আহাদ চৌধুরীর সঙ্গে চলে গেছে মণীষা দ্বীপে।

কি ভাবছো বনহুর।

ভাবছি মণীষা দ্বীপের সেই ভয়ংকর অবস্থার কথা। ভীষণ জলোচ্ছাস ও সাইক্লোন এর পেছনে রয়েছে এক রহস্যময় অবস্থা, যার সঙ্গে মোকাবেলা করা একান্ত দরকার বলে মনে করছি।

বনহুর, আমি জানি এবং জানি বলেই তোমাকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছি।

সত্যি বলছো ইলোরা?

হা। বহুকাল না হলেও সুদীর্ঘ সময় আমাকে হামবার্ডের এই ডুবু জাহাজে অবস্থান করতে হয়েছে, কাজেই হামবার্ডের অনেক কিছুই আমার জানা রয়েছে।

তাহলে মণীষা দ্বীপের গোপন রহস্য সম্বন্ধে তুমি জানো?

হাঁ, সব জানি।

ডুবু জাহাজের শুধু তার মারণাস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা চলছিলো না, চলছিলো অন্য কোনো স্থানেও।

সে স্থান হলো মণীষা দ্বীপ। জলদস্যু হামবার্ড বেছে নিয়েছিলো এমন একটা দ্বীপ যেখানে সে তার এই ভয়ংকর গবেষণা চালাবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে চলবে তার মারণাস্ত্র তৈরির খেলা।

তুমি তাহলে......

সর্বতোভাবে তোমাকে সাহায্য করবো বনহুর। কথাটা বলে ইলোরা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললো–অত্যন্ত মারাত্মক এসব কাজ। বনহুর, ভয় হয় পাছে তোমার কোনো অমঙ্গল ঘটে না যায়।

কিছু ভেবো না ইলোরা, তুমি সহযোগিতা করলে কোনো অসুবিধা হবে না আমার।

*

মণীষা দ্বীপ।

এক মহাকাল রাত্রির করাল ছায়া নেমে এসেছিলো এই দ্বীপে। মরেছে বহু মানুষ, জীবজন্তু। গলিত লাশ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এখানে সেখানে নানা জায়গায়।

বিদেশ থেকে এসেছে সাহায্যকারীর দল। তারা এইসব গলিত মৃতদেহ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলেছে। সরিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ ছড়াচ্ছে, যাতে কোনো ব্যাধি আবার মহাকাল হয়ে যারা জীবিত আছে তাদের জীবন নিঃশেষ করে না দেয়।

দস্যুরাণী আর আহাদ চৌধুরী প্রচুর খাবার আর বস্ত্র নিয়ে এসেছে। সবার মধ্যে খাবার এবং বস্ত্র বিলিয়ে দিচ্ছে। রাণী চন্দনা সহ এসেছে মণীষায়। নিজ হাতে সে আহতদের সেবাযত্ন করে চলেছে।

পুলিশবাহিনী অথবা সাহায্যকারীদল তাদেরকে চিনতে পারেনি। তারা স্বেচ্ছাসেবীদের দলে মিলে কাজ করে যাচ্ছে।

এতটুকু ক্লান্তি বা অবসাদ নেই দস্যুরাণী আর চন্দনার মধ্যে। তারা বিপুল উৎসাহ নিয়ে আহত এবং গৃহহারা সর্বহারাদের সেবাযত্ন করে যাচ্ছে।

সারাটা দিন পরিশ্রমের পর তাঁবুতে যখন ফিরে আসে তখন চন্দনা বলে–রাণী, এভাবে খাটলে তুমি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আমাকে নিয়ে তোর এত চিন্তা কেন বতত? মণীষার হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করলো, যারা আজ গৃহহারা, আত্মীয়, বন্ধু–বান্ধব হারা, আমি তাদের সেবা করবো সে তো সৌভাগ্য রে! বলতো কতজন পারে এমনভাবে……

জানি তুমি সব পারো তাই বলে নিজের দিকে চাইবে না?

শুধু কি আমি খাটছি? আহাদ সেও তত খাটছে। মণীষাবাসীর মুখে হাসি ফোঁটাবার জন্য তারও চেষ্টার অবধি নেই।

তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

কিসের এত ধন্যবাদের ছড়াছড়ি? কথাটা বলতে বলতে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

চন্দনা বললো–রাণী আর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি যাচ্ছি দেখি আপনাদের মত একটু পারি কিনা?

পারবে। তুমিও তো কম খাটছে না চন্দনা! সর্বক্ষণ আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। জানি তোমারও বিশ্রাম হচ্ছে না। সমীর তো কাহিল হয়ে পড়েছে।

বললো রাণী–তোমার বন্ধুটি সত্যি কাজের। তার বিপুল দেহটা নিয়ে অনেক করছে। মণীষা বন্দরে যখন আমার জাহাজ নোঙ্গর করলো তখন আমি সমীর বাবুকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কারণ কদিন সমুদ্রযাত্রাতেই তাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো কিন্তু এখন সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

হাঁ, সে কথা অবশ্য সত্য। জাহাজে সমীরকে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছিলো। বারবার সে বমি করছিলো এবং চোখমুখ বিষণ্ন মলিন হয়ে পড়েছিলো। যাক এখন সে সুস্থ এবং তার রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা কাজকর্ম আমাদের মনকে সতেজ করে তুলেছে।

কে–কার কথা বলছো আহাদ? কে তোমাদের মনকে সতেজ করে তুললো? বলতে বলতে তাবুতে প্রবেশ করলো সমীর।

তুমি! তোমার কথাই হচ্ছিলো বন্ধু।

তাই বলো। আমি ছাড়া তোমাদের মনের খোরাক কেই–বা যোগাবে। তা আমার অজ্ঞাতে আমাকে নিয়ে এত আলোচনা কেন শুনি?

এবার রাণী হেসে বললো–সাক্ষাতে প্রশংসা করা উচিত নয় বলে…

মানে?

মানে প্রশংসায় গর্ব বাড়ে তাই.....

ও বুঝেছি, আমার নিন্দে করা হচ্ছিলো বুঝি?

বললেন আহাদ চৌধুরী–আমার বন্ধুর সম্বন্ধে মন্দ বলবে কেউ তার নাক ঘুষিয়ে ফাটিয়ে দেবো না।

যাক তোমার বন্ধুর প্রশংসাও করতে চাইনে, আর নিন্দারও দরকার নেই। বলো তোমরা কি খাবে–চা না কফি?

হু, তা তো সত্যি। কিছু খেতেই হয় কারণ আবার এক্ষুণি বেরুতে হবে।

বলো কি খাবে, চন্দনা প্রস্তুত আছে।

হাঁ বলুন? বললো চন্দনা।

সমীর বললো–যা পরিশ্রম হয়েছে শুধু চা আর কফিতে হবে না।

তবে কি হুকুম করো বন্ধু? বললেন আহাদ চৌধুরী।

চন্দনা বললো–বলতে হবে না, আমি আনবো যা আপনাদের ভাল লাগবে।

হেসে বললেন মিঃ আহাদ–আমি জানি চন্দনা সব বোঝে, জানে...

ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে চন্দনা।

ঠিক ঐ সময় একজন স্বেচ্ছাসেবী এসে জানালো মণীষা সাগরে একটা বৃহৎ আকার বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বস্তুটি কি এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে অনেকেই সন্দেহ করছে একটা কোনো জলজীব হবে।

মিঃ আহাদ বললেন–রাণী, আবার নতুন এক সমস্যা দেখা দিলো।

দস্যুরাণী কিছু ভাবছিলো, বললো–জলজীব না হয়ে কোনো ডুবু জাহাজ হতে পারে। কারণ আমার প্রথমেই একটা সন্দেহ হচ্ছিলো।

বলো কি তোমার সন্দেহটা? বললেন মিঃ আহাদ চৌধুরী।

বললো রাণী–তুমি বলেছিলে মণীষা দ্বীপের অভ্যন্তরে কোনো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। সেই রহস্যের সূত্রই হলো ঐ বস্তুটি।

হাঁ, আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। এবার মিঃ আহাদ চৌধুরী কথাটা বললেন। তারপর যে লোকটি এই সংবাদ বহন করে এনেছিলো তাকে লক্ষ্য করে বললেন– তুমি কতদূর জানো ঘটনাটা খুলে বলো?

রাণীই জবাব দিলো–ও বলবার পূর্বে আমি নিজে অন্য একজনের মুখে শুনেছিলাম, গভীর রাতে নাকি একটা আলোকরশ্মি, মণীষা সাগরের মাঝামাঝি পরিলক্ষিত হয়।

এ কথা আগে বলোনি কেন রাণী?

আগে থেকে বললে সব মাটি হয়ে যাবে তাই কাউকেই না বলে আমি নিজে সন্ধান চালিয়ে চলেছি।

এ কারণেই তুমি অনুমান করছে ওটা কোনো জীব নয়, কোনো ডুবু জাহাজ হবে?

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়। কারণ কোনো সামুদ্রিক জীব এভাবে আলো ছড়াতে পারে না। আহাদ, তুমি যদি দেখতে চাও তাহলে নিয়ে যাবো তোমাকে। আমার মনে হয় কোনো শত্রুপক্ষ মণীষা দ্বীপের জনগণের ধ্বংস কামনা করে মণীষা সাগরের গভীর অতলে আত্মগোপন করে গভীর রাতে সে সার্চলাইট জ্বেলে সন্ধান করে ফেরে কোনো অমঙ্গল ঘটানোর……

রাণীর কথা শেষ হয় না, চন্দনা ট্রেতে জলখাবার ও কফি নিয়ে হাজির হয় সেখানে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী বলেন–এবার জলখাবার খেয়ে গরম কফি পান করে নাও সবাই। মিঃ আহাদ চন্দনার হাত থেকে ট্রে তুলে নিয়ে রাণীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

রাণী মিঃ আহাদের হাত থেকে ট্রে নিয়ে টেবিলে রেখে বললো–আজ তোমাকে দেখাবো। হাঁ, তার পূর্বে ওর কাছে আরও ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার বলে মনে করছি।

মিঃ আহাদ স্বেচ্ছাসেবীকে লক্ষ্য করে বললো–বলো দেখি তুমি কতদূর কি জানো?

স্বেচ্ছাসেবী লোকটা বললো–আমাদের কেউ কেউ সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে দেখেছে, দূরে গভীর সাগরে কোনো একটা আশ্চর্য ধরনের বস্তু ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে আবার তলিয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতে বস্তুটা আলো ছড়ায়। এ আলোর রশ্মি তীর থেকেও অনেকে দেখেছে।

রাণীর কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবীর বর্ণনাগুলো! মিঃ আহাদ বেশ চিন্তিত হলেন।

মণীষা দ্বীপবাসীদের মনে ভীষণ একটা আতংক। তারা ইতিমধ্যে হারিয়েছে আপনজনকে, হারিয়েছে আশ্রয়স্থল এমন কি অনেকের পরিধেয় বস্ত্রখানাও হারিয়ে গেছে কোথায়। সবাই রিক্ত সর্বহারা, তারপর জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। মহাকাল রাক্ষসী মণীষা সাগর তাদের সবকিছু গ্রাস করেছে। আবার সেই মণীষা সাগরের বুকে বিস্ময়কর আলোর খেলা, মণীষাবাসীর মনে ভীষণ এক ভীতি ভাব এনে দিয়েছে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী, রাণী চন্দনা আর সমীর বাবুকে নিয়ে এক দূরদেশে এসেছেন, মণীষার গভীর রহস্য উদঘাটন আশায় কিন্তু সুদীর্ঘ সময় নানাভাবে গবেষণা চালিয়েও কোনো হদিস খুঁজে পাননি এই রহস্যের।

আজ নতুন এক সংবাদে মিঃ আহাদ বেশ চিন্তিত হলেন।

রাণীর সঙ্গে চললো নানা ধরনের আলোচনা।

ঐ আলো আর মাঝে মাঝে যে বস্তুটি মণীষা সাগরের বুকে দেখা যাচ্ছে তার সন্ধান জানতে হবে।

দস্যুরাণী ওয়্যারলেসে তার নিজস্ব সাবমেরিন চালককে আরাকান থেকে মণীষা সাগরে আসার জন্য জানিয়ে দিলো। মিঃ আহাদকে বললো–তুমি কিছু

ভেবো না আহাদ, আমি নিজে খুঁজে বের করবো এই রহস্যের মূল সূত্র।

কিন্তু সাবমেরিন নিয়ে তুমি পারবে মণীষা সাগরের তলে সন্ধান চালাতে?

তোমার রাণী সব পারে। তুমি দেখো আমি পারবো।

রাণী!

বলো?

ভয় হয় মণীষা তোমাকে আবার গ্রাস না করে।

আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তার অন্ত নেই। সত্যি তুমি ছাড়া আমার জন্য ভাবার কেউ নেই।

চন্দনা বলে উঠলো–আমি বুঝি একটুও ভাবি না তোমার জন্য?

ও, তোর কথা ভুলেই গেছি!

মনে রেখো আমার ব্যথা তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি।

জানিরে জানি।

হাসেন আহাদ চৌধুরী।

গভীর রাত।

চমকে উঠলেন মিঃ আহাদ, পাশে রাণী নেই।

শিয়রে টেবিলে ল্যাম্প জ্বলছিলো। ডিম করা ছিলো আলোটা, মিঃ আহাদ আলোটা বাড়িয়ে দিলেন। তাকালেন তাঁবুর মধ্যে চারদিকে।

কোথাও রাণী নেই।

একটা দুশ্চিন্তা জাগলো আহাদ চৌধুরীর মনে। ভাবছেন মিঃ আহাদ চৌধুরী তবে কি চন্দনার তাবুতে গেছে সে? হয়তো তাই হবে। শয্যা ত্যাগ করে মিঃ আহাদ

উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জমকালো পোশাকপরা অবস্থায় রাণী প্রবেশ করলো তাঁবুতে। ডিমলাইটের আলোতে রাণীর দেহের জমকালো পোশাক চক চক করে উঠলো।

মিঃ আহাদ রাণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলেন। এ পোশাকে তিনি বহুবার রাণীকে দেখেছেন তবু তার দুচোখে বিস্ময়। কালো প্যান্ট, কালো জামা, কোমরের বেল্টে রিভলভার, মাথায় জমকালো ক্যাপ–এ ড্রেসে রাণীকে অদ্ভুত মানায়। পায়ে ভারী বুট।

রাণী হেসে বলে–কি দেখছো অমন করে?

তোমাকে।

আজ বুঝি নতুন?

না।

তবে?

হঠাৎ শয্যা খালি তারপর তোমার এ ড্রেস, বলো তো ব্যাপারটা কি?

তুমি ঘুমোও, আমি চন্দনাকে নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছি।

সাগরের বুকে আলোর খেলা দেখতে?

না

তাহলে কোথায় যাবে এই রাতদুপুরে?

সব কি তোমার না শুনলে নয়?

বলো ক্ষতি কি? আর যদি না বলতে চাও বা আপত্তি থাকে তাহলে থাক।

তোমাকে না বলে কি পারি?

তবে বলো?

আরাকান থেকে আমার সাবমেরিন এসে পৌঁছেছে। আমি মণীষা সাগরের তীরে যাবো, কথা আছে সাবমেরিন চালকের সঙ্গে।

কিন্তু তুমি তো ওয়্যারলেসে কথা বলতে পারো তার সাথে?

লক্ষ্মীটি অবুঝ হচ্ছো কেন। ঘুমোও, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবো। বাইরে চন্দনা অপেক্ষা করছে।

আচ্ছা যাও।

রাগ করলে না তো?

তাতে তোমার কি এসে যায়!

আবার অভিমান? তুমি বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ। কাজেই তোমার অভিমান চলে না।

বললাম তো যাও। কোনো অভিমান আমার নেই।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি, যাও রাণী।

আসি কেমন? বেরিয়ে গেলো রাণী।

চন্দনা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো, রাণী আসতেই সে বললো–বড় দেরী করে ফেললে রাণী।

কি করবো বল। আহাদের কাছে ছুটি পেলে তো?

চল তাড়াতাড়ি।

মণীষা সাগরতীরে পৌঁছবার জন্য তারা দ্রুত পা বাড়ালো।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাণী আর চন্দনা এসে পৌঁছলো মণীষা সাগরতীরে।

ঠিক ঐ সময় মুহূর্তে চন্দনা আর রাণীকে ঘিরে ফেললো একটি জাল।

রাণী আর চন্দনা জালে জড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো, কারণ জালে ক্লোরোফরম মেশানো ছিলো। রাণী আর চন্দনা সংজ্ঞা হারালো। ওরা বুঝতে পারলো না কে বা কারা তাদের ওপর জাল নিক্ষেপ করেছিলো।

মিঃ আহাদ কিন্তু লুকিয়ে রাণীর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাণী আর চন্দনাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বেশ দূরত্ব রেখে।

মিঃ আহাদ চৌধুরীর শরীরে ছিলো কালো ওভারকোট, তাই তাকে অন্ধকারে মোটেই দেখা যাচ্ছিলো না।

মণীষা সাগরতীরে পৌঁছে মিঃ আহাদ আর দেখতে পেলেন না রাণী ও চন্দনাকে। বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন মিঃ আহাদ। এতক্ষণ আবছা অন্ধকারেও ঠিকভাবে অনুসরণ করে আসছিলেন অথচ এ মুহূর্তে গেলো কোথায় ওরা?

নিপুণ দৃষ্টিতে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন কিন্তু কোথাও ওদের একটু চিহ্ন দেখতে পেলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন এক সময় মিঃ আহাদ চৌধুরী। ভোর হয়ে এসেছে তখন।

সমীর পাশের তাবুতে ঘুমোচ্ছিলো।

মিঃ আহাদ তাকে ডাকলেন এবং বললেন সমস্ত ঘটনা।

সব শুনে সমীর বেশ ঘাবড়ে গেলো, বললো সে–প্রথমেই আমাকে ডাকোনি কেন? ডাকলে আমিও তোমার সাথে ফলো করতাম, তাহলে দুজনের দৃষ্টি থেকে রাণী আর চন্দনা হাওয়ায় উবে যেতো না।

মিঃ আহাদ গম্ভীর চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললেন–তুমি ঠিক বলেছো সমীর, ওরা যেন হাওয়ায় উবে গেলো।

তাহলে উপায়?

চলো দিনের আলোয় একবার সন্ধান করা যাক। তবে আমার মনে হয় ওরা কোনো গোপন স্থানে,....

হাঁ, আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। মিঃ আহাদের কথার মাঝখানে সমীর বললো।

একটু চিন্তা করে বললেন মিঃ আহাদ–ভোর হয়ে এলো তবু ফিরে এলো না। আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

রাণীর বেলায় বড় ঘাবড়ে যাও তুমি, আহাদ।

কি জানি কেমন যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

চলো তাহলে বেরিয়ে পড়ি। বললো সমীর কুমার।

মিঃ আহাদ বললেন–এখনও সূর্য ওঠেনি, এখনও মণীষাবাসী জেগে ওঠেনি, চলো যাই......মনে হচ্ছে সমুদ্রের বুকে যে বিস্ময়কর বস্তু আলো ছড়াচ্ছে এটা সাধারণ কোনো বস্তু নয়, এটাই মণীষা দ্বীপের রহস্য।

রাণী আর চন্দনা কি তাহলে সেই রহস্যের শিকার হয়েছে?

বললেন মিঃ আহাদ–জানি না, হতেও পারে। কে জানে ওরা এখন কোথায়?

চলতে শুরু করলেন মিঃ আহাদ আর সমীর কুমার।

সারাটা দিন সন্ধান চালিয়েও খোঁজ না পেয়ে মণীষা পুলিশ অফিসে সংবাদটা জানালেন মিঃ আহাদ।

মণীষা পুলিশপ্রধান আরমান লু মিঃ আহাদ ও সমীরকে নিয়ে সমুদ্রতীরে এলেন এবং যে স্থানে আসার পর রাণী আর চন্দনা নিখোঁজ হয়েছে, ঐ স্থানটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

বালিতে সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে পড়ায় তেমন কোনো চিহ্ন এমন কি ভারী বুটের ছাপও নজরে পড়লো না কিন্তু এই জায়গাটাতেই ওরা এসে দাঁড়িয়েছিলো।

পুলিশপ্রধান বললেন–আপনি কি একেবারে নিশ্চিত যে ওরা দুজন ঠিক এই জায়গায় এসে দাঁড়ানোর পর উধাও হয়েছে।

হাঁ, আমি নিশ্চিত এখানে আসার পর আর তাদের দেখতে পাইনি।

আপনার কি মনে হয় মিঃ চৌধুরী? বললেন পুলিশপ্রধান।

মিঃ আহাদ বললেন–নিশ্চয়ই তারা স্বেচ্ছায় কোথাও আত্মগোপন করেনি। হয়তো কোনো শত্রু তাদের দুজনকে সরিয়েছে।

এমনও তো হতে পারে তারা সমুদ্রের প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাতে ভেসে গেছে। বললেন মিঃ আরমান লু।

আহাদ চৌধুরী বললেন–অসম্ভব মিঃ লু, ঢেউয়ের আঘাতে ওরা ভেসে যাবে না কারণ রাণী আর চন্দনা সুদক্ষ সাঁতারু, গভীর সাগরের প্রচন্ড ঢেউকে প্রতিহত করে সে একবার আমাকে রক্ষা করেছিলো। এখানে তো সেরকম ঢেউও না।

হঠাৎ সমীর বলে উঠলো–ঐ দেখো, দেখো ওখানে কি যেন একটা চক করছে বালির মধ্যে। সমীর কথাটা বলে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চকচকে বস্তুটা তুলে নিলো হাতে।

মিঃ আহাদ ঝুঁকে বস্তুটি দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন–এটা তো রাণীর আংটি!

হাঁ, আমি আশ্চর্য হচ্ছি রাণীর আংগুল থেকে আংটি খসে পড়লো কি করে? এটা তো আমি রাণীর আংগুলেই দেখেছিলাম।

এবার মিঃ আহাদ আংটিটা সমীরের হাত থেকে নিয়ে বার দু ঘুরিয়ে ফিরে দেখলেন, হয়তো বা রাণীর ছোঁয়া অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন তিনি। তারপর আংটিটা পুলিশপ্রধানের হাতে দিয়ে বললেন–মিঃ লু, এ আংটি রাণী ইচ্ছা করে খুলে ফেলে দিয়ে গেছে, যেন সাগরতীরে সন্ধান করতে এসে আমরা এটা পেয়ে বুঝতে পারি…এ আংটি তার আংগুল থেকে আপনা আপনি খসে পড়বে না।

সমীর বললো–ঠিক বলেছো আহাদ, এটা রাণীর একটা সংকেত চিহ্ন।

মণীষা পুলিশপ্রধান মিঃ লু আংটিটার দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলেন। কি ভাবছেন তিনি জানেন।

এখানে যখন দস্যুরাণী আর চন্দনাকে নিয়ে নানা ধরনের আলাপ আলোচনা এবং গবেষণা চলছে তখন একটি বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথে ওদের দুজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওরা জানে না।

দস্যুরাণী আর চন্দনার হাত দুখানা পিছোঁড়া করে বাঁধা ছিলো। এক ধরনের প্লাস্টিক রবার দিয়ে মুখ বাঁধা। ওরা কোনো কথাই বলতে পারছে না। ওদের নিয়ে যাওয়া হলো এমন এক জায়গায় যেখানে একটি বৃহৎ কারখানা। কারখানাটি ভূগর্ভে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দস্যুরাণী আর চন্দনাকে সেই ভূগর্ভ কারখানায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে একটি কক্ষে আটকে রাখা হলো। সেখানে হাতের এবং মুখের বাধন খুলে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাণী বুঝতে পারলো যেখানে তাদের আনা হলো এটা কোনো মারাত্মক অস্ত্র তৈরি কারখানা এবং তা অতি গোপনে ভূগর্ভে করা হচ্ছে। দস্যুরাণী পূর্বে জানতে পেরেছিলো কোনো এক স্থানে এক ভয়ংকর অস্ত্রকারখানায় মারণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে কিন্তু কোথায় তা সে ঠিক জানতো না। যখন মিঃ আহাদ চৌধুরী বলেছিলেন মণীষা দ্বীপের গহ্বরে কোনো একটা রহস্য বিরাজ করছে, যার জন্য মাঝে মধ্যেই দেখা দেয় মণীষায় ভীষণ জলোচ্ছাস আর সাইক্লোন। হাজার হাজার লোক হয় গৃহহারা, নয় নিহত। অনেকগুলো মৃত্যুমলিন করুণ মুখে ভেসে উঠলো রাণীর চোখের সামনে।

বললো চন্দনা–কি ভাবছো রাণী?

ভাবছি মিঃ চৌধুরী আর তাঁর দলবল আমাদের উধাও ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো সমুদ্রতীরে সন্ধান চালিয়ে চলেছে। যদি আমার আংটিটা আহাদের চোখে পড়ে যায় তাহলে ঠিক বুঝতে পারবে আমরা আটকা পড়ে গেছি……

রাণী, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

কি রকম?

আমাদের এভাবে হঠাৎ বন্দী করার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

একটু হেসে বললো রাণী–আমরা যে মণিষার গোপন রহস্য উদঘাটন ব্যাপারেই মণীষা দ্বীপে অবস্থান করছি, এ কথা তারা জানে যারা আমাদের আটক করেছে।

কিন্তু……

মিঃ চৌধুরীও বিপদমুক্ত নয়। কারণ আমাদের সরানোর পর তার ওপরেও চলবে নির্যাতন, তাকে আটক করতে না পারলে এদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

এরা কারা?

এ প্রশ্ন আমার মনেও।

সত্যি সব যেন রহস্যময়।

হাঁ, মণীষা দ্বীপ আজ এক রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছে। এ রহস্যজাল ছিন্ন করে মণীষাকে উদ্ধার করতেই হবে।

রাণী, আমরাই যে রহস্যজালে জড়িয়ে পড়লাম! কেন তুমি রাতদুপুরে সমুদ্রতীরে আমাকে। নিয়ে গিয়েছিলে সমুদ্রের সেই ভৌতিক আলো দেখার জন্য?

আমি জানতাম ঐ ভৌতিক আলোর সঙ্গে মণীষার রহস্য জড়িয়ে আছে। আর সেই কারণেই গিয়েছিলাম। একটু থেমে বললো রাণী–আমি জানতাম কেউ বা কারা আমাদের কাজকর্ম ফলো করছে। আর যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর বিপদ নেমে আসতে পারে।

তুমি যা ভেবেছিলে রাণী তাই হলো। বিপদ নেমে এলো তোমার আর আমার ওপর।

চন্দনা, কিছু ভাবিস না, বিপদ না এলে জয়ী হওয়া যায় না। আমার ভরসা আছে আমি জয়যুক্ত হবে। মণীষা দ্বীপের গভীর রহস্য আমি উদঘাটন করবোই।

এই ভূগর্ভে বসে তুমি গভীর রহস্য উদঘাটন করবে বলে আশা পোষণ করছো?

হা চন্দনা।

রাণী!

চুপ, কে যেন আসছে।

রাণী আর চন্দনা নিশ্চুপ বসে রইলো।

দুজন লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

কক্ষটি বৃহদাকার।

এক পাশে রাণী আর চন্দনাকে বন্দী করে রাখা হলেও তাদের হাত পা এবং মুখ মুক্ত ছিলো।

দুজন লোক কথা বলছে।

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

চাপাকণ্ঠে বললো রাণী–ওরা এদিকে আসছে।

চন্দনা রাণীর মতই চাপাকণ্ঠে বললো–হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে না জানি কি কারণে আসছে ওরা?

কেন, ভয় হচ্ছে নাকি?

তুমি পাশে আছো তাই কতকটা নির্ভয় তবুও বুকটা ধক ধক করছে।

ঐ তো ওরা এসে পড়লো বলে।

শোনা গেলো একটা কণ্ঠ–আজ প্রায় দুসপ্তাহ হতে চললো সর্দারের কোনো হদিস মিলছে না। ব্যাপার যেন কেমন লাগছে।

হাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ততক্ষণে লোক দুজন রাণী আর চন্দনার কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাদের মধ্য হতে একজন বললো–আমরা তোমাদের কাছে কেন এসেছি জানো?

তা কেমন করে জানবো বলো? বললো চন্দনা।

রাণী নীরব।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বললো–তোমরা মণীষা দ্বীপের গোপন রহস্য উদঘাটন ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগে গেছো, তাই তোমাদের আটক করা হয়েছে। এবার মিঃ আহাদ চৌধুরীর পালা।

আহাদ চৌধুরী।...তার নাম তোমরা জানো? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো চন্দনা।

রাণীর দুচোখেও বিস্ময়, এরা সব জানে। এদের কাছে তাহলে গোপন নেই কিছু। এমনকি তাদের নামও জানে এরা.....

প্রথম ব্যক্তি রাণীকে লক্ষ্য করে বললো–তোমরা আর কিছুতেই মুক্তি পাবে না। এখানে চিরদিন তোমাদের আটক করে রাখা হবে। অবশ্য সর্দার ফিরে এলে তোমাদের কাজ দেওয়া হবে। তোমাদের আমরা হত্যা করবো না, কারণ প্রয়োজন আছে তোমাদেরও।

সর্দার! কে তোমাদের সর্দার?

জলদস্যু হামবার্ড!

সে আর ফিরে আসবে না জেনে রাখো। কে যেন তাদের পেছন থেকে কথাটা বললো।

একসঙ্গে চমকে ফিরে তাকালো সবাই।

জমকালো পোশাকপা, মুখমন্ডলের অর্ধেক ঢাকা পাগড়ির আঁচলে।

রাণী অস্ফুট কণ্ঠে বললো–তুমি?

ভূগর্ভের সেই অনুচরদ্বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তারা ভাবতেও পারেনি এই গোপন স্থানে কেউ প্রবেশ করতে পারে। এখানে প্রবেশের একমাত্র পথ সাগরগর্ভে–সুকৌশলে সেই প্রবেশমুখ তৈরি করা হয়েছে। সে পথ অতি দুর্গম, কোনো রকমে কেউ এ পথের খোঁজ পাবে না।

জমকালো পোশাকপরা ব্যক্তি বললো–তোমাদের সর্দার আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, কারণ তাকে তারই ডুবু জাহাজে যাতাকলে পিষে মারা হয়েছে।

অনুচরদ্বয়ের একজন বলে উঠলো–সর্দার হামবার্ড বেঁচে নেই।

না। তার ডুবু জাহাজখানা এখন আমার কবলে।

তুমি তাহলে,...

হাঁ, আমি বনহুর।

সর্বনাশ, আমাদের সব প্রচেষ্টা তাহলে......

সমূলে ধ্বংস হবে। বললো বনহুর।

দস্যুরাণী আর চন্দনার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। তারা ভাবতেও পারেনি এই দুর্গম ভয়ংকর গোপন স্থানে কেউ তাদের সন্ধান পাবে। রাণী নিজ মনেই পরিকল্পনা করে নিচ্ছিলো কিভাবে এদের এই ভূগর্ভ ঘাঁটি ধ্বংস করা যাবে। কি করে তারা পৃথিবীর বুকে ফিরে যাবে......ভাবতে পারেনি তারা বনহুর এখানে আসবে।

বনহুর বললো–তোমরা কোনোরকম চালাকি না করে আমায় সহযোগিতা করো তবু প্রাণে বাঁচবে।

একজন বললো–জানো এখানে আমরা কোন্ কাজে নিয়োজিত আছি?

জানি তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত আছো। তোমরা যে মারণাস্ত্র তৈরি করার প্রস্তুতি নিয়েছে তা সার্থক হবে না। আমি এ খানে প্রবেশ করেই প্রথমে বন্দী করেছি হামবার্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক ম্যারোথা বীন ও তার সহকারীকে।

বলো কি! একজন আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো।

বললো বনহুর–বৈজ্ঞানিক ম্যারোথা বীন আর তার সহকারীই শুধু নয়, আমি সবাইকে বন্দী করেছি। আর একজন বৈজ্ঞানিক নিজেই মারা পড়েছে।

কোথায় তারা বললো দ্বিতীয় ব্যক্তিটি।

বনহুর বললো–রাণী আর চন্দনাকে যেদিন তোমরা সমুদ্রতীর হতে কৌশলে বন্দী করলে ঐ সময় তোমাদের ডুবু জাহাজ থেকে সব আমি লক্ষ্য করেছি এবং দ্রুত আমি তোমাদের পাশে এসে পড়ি ডুবুজাহাজের বৈদ্যুতিক বোটযোগে। ইচ্ছা করলে রাণী আর চন্দনাকে তখনই উদ্ধার করতে পারতাম।

তাহলে করোনি কেন? বললো অনুচরদের একজন।

বনহুর হেসে বললো—-তখন রাণী আর চন্দনাকে উদ্ধার করে নিলে এই মুহূর্তে তোমাদের ভূগর্ভ–আস্তানায় প্রবেশ করা কঠিন হতো।

তাহলে তুমি……

হাঁ, আমি রাণী আর চন্দনার সঙ্গেই তোমাদের এই গোপন আস্তানায় প্রবেশ করেছি। শুধু প্রবেশ করিনি। তোমাদের ঘাটির সবাইকে আমি আটক করেছি…….

তার মানে? বললো একজন।

দ্বিতীয়জন বললো–তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

তোমার বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। জেনে রেখো তোমরা আমার বন্দী। রাণী এই নাও……একটি রিভলভার প্যান্টের পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দিলো রাণীর দিকে।

খপ করে ধরে ফেললো রাণী, তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলভার উদ্যত করে ধরলো লোক দুজনের বুক লক্ষ করে।

বনহুর নিজেও রিভলভার উদ্যত করে ধরলো।

লোক দুজন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তারা ভাবতেও পারেনি এমনভাবে তাদের বন্দী হতে হবে। সব যেন কেমন এলো মেলো লাগছে ওদের কাছে। সর্দার হামবার্ড নিহত, কথাটা ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু যখন জানতে পারলো ডুবু জাহাজখানা এখন বনহুরের আয়ত্তে তখন ওরা কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেলো। মুখ কালো হলো অনুচরদ্বয়ের।

বনহুর ওদের বেধে ফেললো মজবুত করে।

বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ওরা বিফলকাম হলো। ওদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিলো না ঐ সময়

লোক দুজনকে একটা থামের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে রেখে ওরা তিনজন এগুলো।

বিস্ময়ে ওদের চক্ষুস্থির।

এমন অদ্ভুত কারখানা তারা ইতিপূর্বে দেখেনি। যে কারখানায় মারণাস্ত্র তৈরি হয় এবং তা ভূগর্ভে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক ও তার সহকারীকে অন্যান্যের সঙ্গে আটক করেছে বনহুর কৌশলে।

এবার এ দুজনও আটক হলো।

বনহুর এবার এই কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিলো। কিছুটা এগুতেই ওরা দেখলো লাল নীল আর ধূসর রঙের আলোকরশ্মি এক অদ্ভুত রঙের সৃষ্টি করেছে। আর সেই আলোটা বেরিয়ে আসছে। ওদিকের একটি কক্ষ থেকে।

রাণী বললো–বনহুর, তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না কারণ যে স্থানে আমরা এসে পৌঁছেছি তা অতি ভয়ংকর স্থান। ঐ যে আলোকরশ্মি দেখছো ঐ রশি সাংঘাতিক এবং মারাত্মক।

ঐ রশ্মিগুলো দেখছি দড়ির মত ঘুরপাক খাচ্ছে। সবগুলো আলো কেমন জোরালো মনে হচ্ছে। বললো বনহুর।

রাণী বললো–সবাই সাবধান আমি জানি ঐ রশি যদি একবার কোনো দেহে প্রবেশ করে তাহলে তার মাংসের মধ্যের হাড়গুলো গলে তরল হয়ে যাবে।

তুমি এ ব্যাপারে সজাগ ছিলে বলেই এখন আমরা মস্ত একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম। কিন্তু আমি সবাইকে প্রায় আটক করেছি, কে এই রশ্মি ছড়াচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে কি আরও কেউ আছে। বনহুরের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ মেঝেটা দুলে উঠলো। রাণী চন্দনা আর বনহুর থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

রাণী বলে উঠলো–বনহুর, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা আর বেরুতে পারবো না।

চন্দনা ভয়ার্তকণ্ঠে বললো–দুপাশ থেকে দেয়াল সরে আসছে। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে চন্দনা–দেখুন দেয়ালের মধ্য হতে কেমন সূতীক্ষ ধারালো অস্ত্র বেরিয়ে আসছে……এক্ষুণি আমরা মারা পড়বো……।

রাণী আর বনহুর দেখলো, চন্দনার কথা সত্য। দুপাশের দেয়ালে ভীষণ আর ভয়ংকর ধারালো ছুরি বেরিয়ে এসেছে। দেয়াল ধীরে ধীরে সরে আসছে।

মাঝামাঝি আবদ্ধ হয়ে পড়েছে ওরা তিনজন। রাণী, চন্দনা আর বনহুর। সেকি ভীষণ অবস্থা। চারপাশে বদ্ধ দেয়াল, দুদিকে দেয়াল এগিয়ে আসছে।

বনহুর নিজেও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের তিনজনই ধারালো ছুরিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাণী তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর বললো–রাণী ঘাবড়ে যেও না, একদিন যখন মৃত্যুবরণ করতেই হবে তখন প্রস্তুত হয়ে নাও।

রাণী বললো–কেউ আড়ালে থেকে এই দেয়াল দুটোকে পরিচালনা করছে…..আর বুঝি রক্ষা পাওয়া গেলো না।

বনহুর দুপাশের দুদেয়াল শক্ত করে হাত দুখানা দিয়ে ঠেলে ধরলো ভীষণ আর ভয়ংকরভাবে। সমস্ত মুখমন্ডল রক্তাভ হয়ে উঠলো বনহুরের। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়াল দুটোকে ঠেলে ধরে রাখতে চেষ্টা করছিলো সে। কিন্তু যান্ত্রিক দেয়াল ছোরাসহ এগুচ্ছে, আর সামান্য কিছু এগুলেই তিনজন গেঁথে যাবে সূতীক্ষ্ণধার ছোরায়। রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে সেই দুর্গম স্থানের মেঝেটা।

শেষ পর্যন্ত এভাবে মৃত্যু তাদের ভাগ্যে লেখা ছিলো।

বনহুরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সে সূতীক্ষ্ণধার ছোরাসহ দেয়ালটা ঠেকানোর চেষ্টা করছে। দেয়ালের গায়ে অগণিত সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

এই গেঁথে গেলো বলে।

চন্দনার দুচোখ বন্ধ হয়ে গেছে। আর রক্ষা নেই, চিৎকার করে ডাকলো–হে ঈশ্বর, রক্ষা করো।

বনহুর ভীষণভাবে ঠেলে ধরেছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে হঠাৎ দেয়াল দুটো দুদিকে সরে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো, মাত্র কয়েক মিনিট, দেয়াল দুটো দুপাশে সরে গেলো দ্রুতগতিতে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো কক্ষের দরজা মুক্ত হয়ে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ইলোরা।

বনহুর অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো–ইলোরা তুমি?

ভালভাবে তাকাতেই দেখতে পেলো রাণী, চন্দনা আর বনহুর ইলোরার বুকের কাপড়খানা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ইলোরার মুখে হাসি কিন্তু তা বড় করুণ।

ছুটে এলো বনহুর ইলোরার পাশে।

রাণী আর চন্দনাও দ্রুত এসে দাঁড়ালো।

ইলোরার দেহ টলছে।

কিছু বলতে গেলে ইলোরা।

বনহুর ওকে ধরে ফেললো, আর্তকণ্ঠে বললো–ইলোরা, এ অবস্থা কেন? কে তোমাকে ছোরাবিদ্ধ করেছে?

ইলোরাকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না, মাটিতে পড়ে গেলো সে।

বনহুর ওর মাথাটা তুলে নিলো কোলের ওপর। তারপর বললো–ডুবু জাহাজ থেকে তুমি কেন এসেছিলে এখানে? ইলোরা বলো? বলো ইলোরা?

ইলোরার মুখে ব্যথাভরা করুণ হাসির আভাস লেগে রয়েছে। অতিকষ্টে বললো–ইলোরা–তোমার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমি ডুবুজাহাজ থেকে রবার বোট নিয়ে চলে...... আসি...... পথ আমার....... অজানা...... ছিলোনা...... এ আস্তানা আমার...... পরিচিত.......

হাঁ, তুমিই তো আমাকে এই মারণাস্ত্র তৈরির গোপন আস্তানা দেখিয়ে দিয়েছিলে ইলোরা। ডুবু জাহাজ থেকে তুমি আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছিলে.......

তোমার বিলম্ব...... দেখে...... এসে...... পড়লাম...... যা সন্দেহ...... করেছিলাম....... তাই দেখলাম...... রুশ নামক হামবার্ডের অনুচর...... তোমাদের আটক করে মৃত্যুকক্ষের দেয়াল......অসংখ্য.......ধারালো ছোরা.... বিদ্ধ করে হত্যা করতে...গিয়ে...ছিলো...আমি তার...সব চেষ্টা নষ্ট করে দিয়েছি.... কিন্তু... ও... আমাকে... বাঁচতে... দিলো না... উঃ......বনহুর...... তোমাকে...... বাঁচাতে... পার... লা...ম....ইলোরার ঘাড়টা কাৎ হয়ে পড়লো একপাশে।

বনহুর হাতের বাজুতে চোখ ঢাকলো।

রাণী আর চন্দনার চোখেমুখে বিস্ময়।

ওদের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে, কে এ ইলোরা। ডুবু জাহাজে সেই বা এলো কি করে? বনহুরের সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কি? কিন্তু এখন বনহুরকে তারা কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারলো না, কারণ বনহুরের চোখে অশ্রু, মুখমন্ডলে দারুণ বেদনার ছাপ। ইলোরার ওষ্ঠদ্বয়ের ওপর বনহুরের ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মুক্ত বিন্দুর মত ঝরে ঝরে পড়ছে।

বনহুর ইলোরার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো, চোখেমুখে ফুটে উঠলে একটা কঠিন হিংস্র ভাব। দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

ঠিক ঐ সময় যমদূতের মত একজন এসে দাঁড়ালো, হাতে তার সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছোরায় এখনও তাজা রক্ত লেগে রয়েছে।

এই সেই ব্যক্তি যে ইলোরার বুকে ছোরাবিদ্ধ করে তাকে হত্যা করেছে। মহুর্ত বিলম্ব না করে বনহুর লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভীষণভাবে আক্রমণ

করলো বনহুর ওকে।

লোকটা ছোরাখানা বনহুরের বুকে বিদ্ধ করার চেষ্টা চালালো কিন্তু সফল হলো না। চললো ভয়ংকর লড়াই।

রাণী আর চন্দনা হতবাক, বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে বনহুর আর যমদূতের মত লোকটার মধ্যে লড়াই। সিংহ আর বাঘের যেন লড়াই চলছে। কেউ কাউকে কাবু করতে পারছে না। লোকটার দেহে অসুরের শক্তি যেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনহুরের কাছে যমদূতের যম লোকটা পরাজিত হলো। যে ছোরা দিয়ে সে ইলোরাকে হত্যা করেছিলো সেই ছোরাখানা বনহুর ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সমূলে বসিয়ে দিলো ওর পেটে।

ছোরাখানা সমূলে পেটে বিদ্ধ হওয়ায় যমদূতের মত লোকটা পেট চেপে ধরে বসে পড়লো। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে।

বনহুর ওর তলপেটে বসিয়ে দিয়েই টেনে তুলে নিয়েছিলো, এবার ছোরাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো একপাশে।

হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিলো বনহুর।

রাণী আর চন্দনা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে। এমন শক্তিশালী পুরুষ তারা ইতিপূর্বে দেখেনি যেন।

বনহুর একবার ইলোরার প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর বললো–রাণী, চন্দনা, তোমরা শিগগীর বেরিয়ে চলো। আমি এই ভূগর্ত পামাণবিক মারণাস্ত্র তৈরির ঘাটি উড়িয়ে দেবো...বনহুর রাণী আর চন্দনাসহ দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। সম্মুখে একটা সুউচ্চ দেয়াল পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর প্রবেশের সময় লক্ষ করেছিলো কিভাবে প্রাচীন বা দেয়ালটা সরে যায়। একটা সুইচ টিপতেই দেয়ালটা একপাশে সরে একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এসেছিলো। বনহুর কৌশল জানে, কাজেই বিলম্ব হলো না। সুইচ টিপতেই দেয়ালটা সরে গেলো একপাশে।

বনহুর চন্দনা আর রাণীকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গপথ ধরে এগুলো। চলতে চলতে বললো বনহুর–রাণী, আমি সবাইকে আটক করেছি, যারা জলদস্যু হামবার্ডের এই গোপন কারখানায় কাজ করতে তারা সবাই অপরাধী। এরা জীবিত থাকলে পুনরায় এই ধরনের অস্ত্র তৈরি ব্যাপারে উৎসাহিত হবে, কাজেই আমি এদের সবাইকে সমূলে ধ্বংস করতে চাই।

রাণী আর চন্দনাকে বনহুর সুড়ঙ্গমুখের বাইরে পৌঁছে দিয়ে বললো আবার সে–তোমরা যত দ্রুত পারো ছুটে সরে যাবে।

আর তুমি? বললো রাণী।

বনহুর বললো–কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমি এই ভূগর্ভ কারখানা ধ্বংস করে দিতে চাই এবং সে কারণেই আমি পুনরায় সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভে হামবার্ডের মারণাস্ত্র তৈরি কারখানায় প্রবেশ করেছি....

কিন্তু...

ভয় নেই রাণী, আবার ফিরে আসবো। একটু হেসে বললো বনহুর।

চন্দনা বলে উঠলো–আমার কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে।

বনহুর ততক্ষণে পুনরায় সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভে প্রবেশ করেছে।

রাণী বললো–চন্দনা, ওকে কেউ বাধা দিতে পারবে না–যা ওর মনে জাগবে তা ও করবেই। বনহুর যতই বলুক ফিরে আসবে হয়তো ফিরে আসা হবে না।

রাণী!

হাঁ চন্দনা, আমি জানি এই ভূগর্ভ কারখানা কত মারাত্মক। চল, আর বিলম্ব করা উচিত হবে না...

চন্দনার হাত ধরে ছুটতে লাগলো রাণী।

মণীষা দ্বীপের বৃহৎ আকার প্রান্তর আর সমুদ্রতীর ধরে ছুটছে ওরা দুজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসে রাণী আর চন্দনা দূরে অনেক দূরে।

ঠিক ঐ সময় প্রচন্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলো। সেকি ভয়ংকর আর সাংঘাতিক শব্দ। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো চন্দনা। রাণীও দুহাতে কান ধরে বসে পড়লো হাঁটু গেড়ে বালির মধ্যে।

দাউ দাউ করে আকাশচুম্বী অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো গলিত পদার্থ, যা অত্যন্ত কঠিন পাথরের টুকরার চেয়েও শক্ত।

রাণী আর চন্দনা তাকালো সেই দিকে।

বেশ বুঝতে পারলো তারা, বনহুর জলদস্যু হামবার্ডের মারণাস্ত্র তৈরির ভূগর্ভ গোপন কারখানাটি ধ্বংস করে দিয়েছে। এমন কোনো মেশিনে বনহুর অগ্নি সংযোগ করেছে যার জন্য সমস্ত কারখানাসহ ভূগর্ভ আস্তানাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।

রাণী আর চন্দনার চোখের সম্মুখে প্রচণ্ড ধূম্রুরাশি কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশটাকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেললো। ভয়ংকর মেঘ গর্জনে মত বারবার শব্দ চারদিক প্রকম্পিত করে তুলছে।

বললো চন্দনা–সব ধ্বংস হয়ে যাবে নাতো? বনহুরও মারা পড়েছে রাণী। মণীষা দ্বীপের গোপন রহস্য ধ্বংস করতে গিয়ে বেচারা নিজেও ধ্বংস হয়ে গেলো। সত্যি রাণী, আমার বুকটা

ওর জন্য হু হু করে কাঁদছে……

রাণী সোজা হয়ে বসলো।

চন্দনা তাকিয়ে দেখলো রাণীর চোখ দুটো ছলছল করছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা রাণীর বুকের ভেতরে যেন তীব্র আর্তনাদ করে ফিরছে। বনহুর যে জীবিত নেই সে কথা তার চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে।

রাণী নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে দূরে বহুদূরে জমকালো ধূম কুন্ডলীর দিকে। তখনও বিস্ফোরণ ঘটছে, সেকি ভয়ংকর গর্জন, কানফাটা শব্দ।

বললো চন্দনা, চলো এবার তাঁবুতে ফেরা যাক।

রাণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–মণীষা দ্বীপ রহস্যমুক্ত হলো, কিন্তু আমরা এখন একজন ব্যক্তিকে হারালাম যার তুলনা হয় না। ...কণ্ঠ ধরে এলো রাণীর।

সত্যি রাণী বনহুর, যদি ঐ মুহূর্তে না পৌঁছাতো তাহলে দেয়ালের সেই ভয়ংকর সূতীক্ষ্ণধার ছোরাগুলো সমূলে বিদ্ধ হতো আমাদের দেহে। ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হতো।

এ কথা সত্য চন্দনা! ওর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

রাণী আর চন্দনার মধ্যে আলাপ হচ্ছিলো ঠিক ঐ সময় দুজন পুলিশ অফিসারসহ মিঃ আহাদ চৌধুরী হাজির হলো সেখানে।

মিঃ আহাদ রাণী আর চন্দনাকে দেখে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন।

পুলিশ অফিসারদ্বয় খুশি হলেন, কারণ তারা মণীষা দ্বীপের প্রতিটি স্থানে তন্নতন্ন করে রাণী আর চন্দনার সন্ধান করে ফিরছেন কিন্তু কোথাও তাদের খোঁজ না পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

মিঃ আহাদ ধারণা করে নিয়েছেন হয়তো মণীষা দ্বীপের রহস্য উদঘাটনে রাণী আর চন্দনা জীবন হারালো। অনেক চিন্তাভাবনা এবং পুলিশমহলের অনুসন্ধানেও তিনি এই মণীষা দ্বীপ রহস্যের কোনো হদিস খুঁজে পাননি। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী। যদিও পুলিশমহল তাঁকে সর্বান্তরকরণে সহযোগিতা করে এসেছেন।

তাবতে বসেই তিনি শুধু ভাবেননি, তিনি রাতের অন্ধকারে গোটা মণীষা দ্বীপ চষে ফিরেছেন। গভীর রাতে তিনি সমুদ্রের বুকে দেখেছেন আলোর খেলা। সব যেন কেমন ঘোলাটে মনে হয়েছে তার কাছে।

সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছিলেন মিঃ আহাদ রাণী আর চন্দনার জন্য। গভীর রাতে দুজন গেলো কোথায়? পুলিশমহলও এ ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। মণীষা দ্বীপের কোনো এক স্থান হতে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ যখন শুনলেন, তখন শুধু মণীষা পুলিশমহল এবং প্রখ্যাত ডিটেকটিভ আহাদ চৌধুরীই স্তম্ভিত হয়নি, মণীষা দ্বীপবাসীদের মনে জেগেছিলো ভীষণ একটা ভয়ার্তভাব। না জানি আবার মণীষাবাসীর অদৃষ্টে কি পরিহাস নেমে এলো।

সবাই আতঙ্কিত ছিলো, কারণ কিছু দিন পূর্বেই তাদের জীবনে এসেছিলো এক মহাপ্লাবন। যে মহাবিপদ তাদের জীবনকে তছনছ করে গিয়ে গেছে। সবাই হারিয়েছে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন, ধনসম্পদ, এমন কি আজ প্রায় সবাই গৃহহারা! আবার গর্জন, না জানি অদৃষ্টে কি ঘটবে। এর পূর্বে ভয়ংকর শব্দটা এসেছিলো সাগরের গভীর জলরাশি থেকে। সবাই ধারণা করেছিলো দেবতা ক্ষেপেছে, তাই তারই হুঙ্কার। সমস্ত সাগর ভীষণভাবে গ্রাস করেছিলো মণীষা দ্বীপটিকে।

আবার আজ সেই শব্দ।

আকাশ কাটানো বিস্ফোরণ।

সবাই বেরিয়ে এসেছিলো নিজ নিজ আবাসস্থল ত্যাগ করে বাইরে। দ্বীপের অদূরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, তার সঙ্গে জমকালো ধূম্ররাশি ছেয়ে আচ্ছাদন করে ফেলেছে সমস্ত আকাশটাকে।

দ্বীপবাসী এবং মণীষা পুলিশবাহিনী সবার মনেই জেগেছিলো বিস্ময়। একি মহাকাল রাত্রির করাল ছায়া আবার নেমে এলো মণীষা দ্বীপবাসীদের অদৃষ্টে।

কিন্তু এবার মণীষা সাগর ক্ষেপেনি, শুধু কানফাটা শব্দ আর ভূমিকম্পের কত কম্পন।

মণীষার গভীর রহস্য আরও যেন প্রকট হয়ে দেখা দিলে মণীষাবাসীর জীবনে। সবাই ভীত আতঙ্কিতভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী মণীষা পুলিশপ্রধান এবং অপর একজন অফিসারসহ বেরিয়ে পড়েছিলোন এবং তারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঐদিকে, যেদিক থেকে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দটা এসেছিলো এবং ধুম্ররাশি কুন্ডলি পাকিয়ে আকাশটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো।

যতই এগুচ্ছিলেন ততই বিস্ফোরণের শব্দ বেশি শোনা যাচ্ছিলো। আহাদ চৌধুরীর সন্দেহ রাণী আর চন্দনা এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত আছে এবং সেইজন্যই তিনি পুলিশ অফিসার দুজনকে নিয়ে সমুদ্রতীর ধরে এগুচ্ছিলেন।

মণীষা দ্বীপের সাগরতীরে একটি বড় পাথরখন্ডের পাশে বসে পড়েছিলো রাণী আর চন্দনা। মিঃ আহাদ চৌধুরী আর পুলিশপ্রধান দুজনের নজরে পড়ে যায় তারা। মিঃ চৌধুরী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন–রাণী, চন্দনা তোমরা এখানে! তোমাদের এ অবস্থা কেন?

রাণী আর চন্দনার চোখমুখ আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা যেন আশার আলো দেখতে পেলো। বিশেষ করে চন্দনা তার চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ছুটে মিঃ চৌধুরীর কাছে এসে বললো–মিঃ চৌধুরী, আমরা সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছি……আর একটু হলেই মারা পড়তাম যদিও আমাদের……

রাণী জানে, দস্যু বনহুরের নাম গোটা বিশ্বময়। এমন কি মণীষা দ্বীপবাসীদেরও অজানা নয় ঐ নাম। পুলিশমহল তাকে পাকড়াও করার জন্য যেমন উদগ্রীব তেমনি বনহুরকেও, কাজেই……রাণী তাড়াতাড়ি চন্দনার পিঠে মৃদু চাপ দিয়ে তাকে কিছু ইংগিত করলো।

রাণী এবার বললো–ভাগ্য প্রসন্ন বলেই আমরা সেই ভয়ংকর স্থান হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এবার পুলিশ অফিসারদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললো রাণী–চলুন, পুলিশ অফিসে বসে সব কথা বলা যাবে।

মণীষা পুলিশপ্রধান বললেন–হাঁ, ঠিক কথা তাই চলুন। তাছাড়া আপনাদের প্রথমে চিকিৎসা এবং বিশ্রামের প্রয়োজন।

বললো চন্দনা–আমরা ক্ষুধা-পিপাসায় মৃতপ্রায়….

বললেন আহাদ চৌধুরী–এবার তোমাদের উচিত সাজা হয়েছে। তোমরা এভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়…..

থাক চলো তোমরা! বললো রাণী।

সবাই এবার ফিরে চললো।

আহাদ চৌধুরী রাণী আর চন্দনাকে চলতে সাহায্য করলেন।

*

মণীষা দ্বীপের অদূরে একটি বৃহদাকার আলোক স্তম্ভ ছিলো। ঐ স্তম্ভটি একদিন জাহাজের নাবিকদের সঠিক পথের সন্ধান দিতো। এখন সেই আলোক স্তম্ভটি ধসে পড়েছে মণীষা সাগরের গহ্বরে।

একদিন এই আলোক স্তম্ভটি দিশেহারা নাবিকদের পথের সন্ধান দিতে, আজ সেই আলোক স্তম্ভটি নাবিকদের শুধু মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, বহু যাত্রীবাহী জাহাজের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজানা নাবিকগণ যখন এই পথে তাদের জাহাজ নিয়ে বিনা দ্বিধায় সাগর পাড়ি দিতে যায় তখন আলোক স্তম্ভের ধ্বংস্তূপে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহাজের তলদেশ ফেঁসে যায় এবং জাহাজখানা সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়, অগণিত যাত্রী প্রাণ হারায়।

এই ধ্বসেপড়া আলোকস্তম্ভের অভ্যন্তর দিয়ে চলে গেছে এই সুড়ঙ্গপথ। হামবার্ড তার মারণাস্ত্র তৈরির ভূগর্ত কারখানার প্রবেশপথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলো এই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথটি।

ইলোরার এপথ জানা ছিলো। সে হামবার্ডের সঙ্গে বহুবার এ পথে ঐ কারখানায় গেছে? জানে সে অনেক কিছু। ইলোরা ডুবু জাহাজ থেকে বার বোট নিয়ে এই ধসেপড়া আলোক স্তম্ভের পাশে আসে এবং সেই গোপন সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে। যে পথে সে বনহুরকেও ঐ ভয়ংকর কারখানায় প্রবেশে সহায়তা করেছিলো।

সম্পূর্ণ একরাত একদিন কেটে গেলো, ইলোরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। নিশ্চুপ থাকতে পারে নি সে, চালকদের অজ্ঞাতে সে ঐ পথে বেরিয়ে এসেছিলো। হামবার্ভ ইলোরাকে কয়েকবার এ পথেই মণীষাদ্বীপের অভ্যন্তরে তার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি কারখানায় নিয়ে গিয়েছিলো, কারণ ইলোরাকে হামবার্ড সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতো। অবশ্য হামবার্ড জানতে ইলোরা কোনো দিনই তাদের এই ডুবু জাহাজ থেকে মুক্তি পাবে না এবং সে এসব কথা কোনো দিনই কারো কাছে ব্যক্ত করার সুযোগ পাবে না। এজন্য সে তাকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে কাছে রাখতে এবং সবকিছু তাকে জানাতে দ্বিধা বোধ করতো না।

ইলোরাও হামবার্ডকে বুঝতে দিতো না তার মনোভাব। সে সুযোগ পেলেই যে ছোবল মারবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। তার সুন্দর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলে হামবার্ড। বাবা মা আত্মীয় স্বজন থেকে বঞ্চিত করেছিলো তাকে। তার শিক্ষাদীক্ষার হয়েছিলো সমাধি। ইলোরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সদ্য খুঁজে

ফিরতো কিন্তু সে জানতো এ ডুবু জাহাজ থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। তাই নীরবে সহ্য করে যেতে হামবার্ড ও তার দলবলের অত্যাচার।

যখন বনহুরকে কৌশলে বন্দী করে আনা হলো এই জাহাজে এবং বনহুরকে আয়ত্তে আনার দায়িত্বভার দেওয়া হলো ইলোরাকে তখন ইলোরা খুব কেঁদেছিলো। কারণ সে জানতো বনহুর নাকি ভয়ংকর এবং দুর্ধর্ষ। এই ধরনের লোককে বশীভূত করা তার পক্ষে কতখানি কঠিন হবে তা সে মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলো। দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ভয় নিয়ে ইলোরা সেদিন বনহুরের ক্যাবিনে প্রবেশ করেছিলো। ক্যাবিনে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তেও বুকখানা তার থরথর করে কাঁপছিলো, না জানি আবার সে কোন নরপশুর শিকার হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো ইলোরা, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি সে। অদ্ভুত দীপ্তময় দুটি চোখ, পদশব্দ শুনতে পেয়ে ক্যাবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

ইলোরার দৃষ্টির সঙ্গে বিনিময় হয়েছিলো বনহুরের। কিছুক্ষণ ইলোরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পুতুলের মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

এতক্ষণ যা ইলোরা ভেবেছিলো আসলে তা নয়। এমন সুপুরুষ সে ইতিপূর্বে দেখেনি। অভিভূত হয়ে পড়েছিলো ইলোরা, পরে তার খেয়াল হলো তাকে পাঠানো হয়েছে যে কারণে সে কথা ভুলেই গেছে সে। হামবার্ড তার আসনে বসে টেলিভিশন পর্দায় দেখছে। সব লক্ষ করছে। শয়তানটা। তার এ দুর্বলতা লক্ষ করে ভীষণ ক্রুদ্ধ হবে সে, তাই ইলোরা সেদিন স্বাভাবিক হতে চেয়েছিলো।

কিন্তু সে চাইলেও পারেনি বনহুরের কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে। নারীসুলভ লজ্জাসংকোচ তার সমস্ত দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো।

তারপর চলেছিলো ইলোরার প্রেমাভিনয়। মিথ্যা অভিনয় করতে গিয়ে ইলোরা নিজেই এ অভিনয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। বনহুরকে সে একদিন সত্যি সত্যি আয়ত্তে আনতে চেষ্টাও করেছিলো মনেপ্রাণে কিন্তু বিফল হয়েছিলো ইলোরা।

রাগ-অভিমান সবকিছু প্রয়োগ করেও ওকে সে পারেনি টলাতে। একদিন ইলোরার মাথা আপনা আপনি নত হয়ে পড়েছিলো বনহুরের কাছে। বনহুরের

তুলনা হয় না, ভালবেসেছিলো ইলোরা ওকে অন্তর দিয়ে। একদিন ইলোরা নিজের জীবন ইতিহাস ব্যক্ত করেছিলো বিনাদ্বিধায় বনহুরের কাছে।

ইলোরা সেদিন বনহুরের চোখেমুখে দেখেছিলো একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ। অনেক কাছের জন ওকে মনে হয়েছিলো সেদিন ইলোরা।

বনহুর সব সময় নারীর মর্যাদা দিয়ে এসেছে। দুঃখ ব্যথা বেদনা থেকে নারী জাতিকে সে সর্বক্ষণ রক্ষা করবে এ ভাবনা সর্বদা তার মনে জাগ্রত ছিলো প্রদীপশিখার মত। ইলোরা তা বেশ উপলব্ধি করেছে সারা অন্তর দিয়ে।

ইলোরার হৃদয়-মন সবকিছু বনহুরের কাছে বাধা পড়েছিলো, বুঝতে পেরেছিলো সে ওর মত মহৎ জন হয় না। তাই ইলোরা ওর কাছে হামবার্ডের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা ব্যক্ত করেছিলো, এমনকি মণীষী দ্বীপের অভ্যন্তরে অস্ত্রাগারের পথের সন্ধান ইলোরাই বলে দিয়েছিলো এবং ডুবু জাহাজটিকে ধ্বসে পড়া আলোক স্তম্ভটির গায়ে সংযোগ করে গোপন সুড়ঙ্গপথে মণীষার অভ্যন্তরে পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরির ঘাটিতে প্রবেশপথ দেখিয়ে দিয়েছিলো সে।

জানতে ইলোরা বনহুরকে সে রুখতে পারবে না, তাই এমন বিপদসংকুল স্থানে যাওয়ার পথ সে বলে দিলো এবং সহায়তা করেছিলো সে সর্বান্তকরণে। কিন্তু বনহুরকে পথ বাতলে দিয়ে ইলোরা নিশ্চুপ থাকতে পারেনি, একটা দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। ওকে এভাবে একা পাঠানো তার ঠিক হয়নি।

ইলোরা পর পরই বনহুরকে অনুসরণ করে ধ্বসে পরা আলোক–স্তম্ভের গহ্বরের সুড়ঙ্গপথে নেমে এসেছিলো। এ পথ ইলোরার অতি পরিচিত ছিলো। এমন কি শুধু পথই নয় মারণাস্ত্র তৈরির ভয়ংকর ঘাটির প্রতিটি স্থান তার পরিচিত ছিলো।

ইলোরা হামবার্ডের সব অভিসন্ধির কথা জানতে এবং তা গোপনে মনে চেপে রেখেছিলো, সুযোগ এলে সে সব ফাঁস করে দেবে।

সে সুযোগ এসেছিলো ইলোরার জীবনে। তাই সে সবকিছু বলেছিলো সেদিন বনহুরকে।

ইলোরা যখন বনহুরের সন্ধানে মণীষা দ্বীপের ভূগর্ভে প্রবেশ করেছিলো তখনই তার মনে একটা দুশ্চিন্তার রেখাপাত হয়েছিলো। তাই সে ছুটে গিয়েছিলো ঐ

স্থানে যে স্থানে হামবার্ডের বিশ্বস্ত অনুচর লর্ড রুশী বসে সুইচ টিপছে।

যা সন্দেহ করেছিলো ইলোরা তাই হলো।

লর্ড রুশী সুইচ টিপে ধরে সেই সূতীক্ষ্ণধার অস্ত্রসহ দেয়াল দুটোকে চাপ দিয়ে চলেছিলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে ইলোরা গিয়ে যদি না পৌঁছতো তাহলে কোনোরকমে রাণী চন্দনা আর বনহুর জীবনে বাঁচতে পারতো না।

ইলোরা যখন লর্ড রুশের পাজরে একটি সূতীক্ষ্ণধার ছোরা সমূলে বসিয়ে দিয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে সুইচ থেকে হাতখানা তার সরে এসেছিলো। ঐ মুহূর্তে দেয়াল দুটো দুপাশে সরে গিয়েছিলো দ্রুতগতিতে।

সদ্য মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেয়েছিলো বনহুর, রাণী আর চন্দনা। ইলোরা জানতো না বনহুরের সঙ্গে আরও কউ আছে বা ছিলো। সে লর্ড রুশোকে হত্যা করে যেমনি ফিরে দাঁড়িয়েছে অমনি হামবার্ডের এক অনুচর যমদূতের মত ওর চেহারা সেই নরপশু সূতীক্ষ্ণধার ছোরা হাতে এগিয়ে এলো।

ইলোরার মুখমন্ডল মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে ভাবতেও পারেনি এখানে কেউ এসে পড়বে। ইলোরা লর্ড রুশকে হত্যা করে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো, ভেবেছিলো আবার সে পাবে বনহুরকে পাশে, নিয়ে যাবে সে ডুবু জাহাজে। কিন্তু সে সুযোগ তার হলো না, যমদূত নরপশু তার হস্তস্থিত ছোরাখানা ইলোরার বুকে বসিয়ে দিয়ে আবার টেনে তুলে নিলো। সে বুঝতে পারলো ইলোরা আর বাঁচবে না। এগিয়ে গেলো সে লর্ডরুশোর দিকে।

ইলোরা তখন ক্ষতস্থান চেপে ধরেছে।

তাজা লাল রক্ত সিক্ত করে তুলেছে তার পরিধেয় বস্ত্র। ইলোরা বুক চেপে ধরে এগিয়ে গেলো সেই দিকে, যেখানে বনহুরকে দেয়ালে ছোরাবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়েছিলো।

বনহুরকে ইলোরা পাশে পেয়েছিলো মৃত্যুমুহূর্তে। এটাই ছিলো তার বড় সাধ, বনহুরকে সে না পেলেও তাকে শেষ বারের মত দেখতে পেয়েছিলো।

*

রাণী আর চন্দনাকে অস্ত্রাগারের বাইরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছিলো বনহুর আবার ইলোরার পাশে। ইলোরার বুকের রক্ত তখনও জমে যায়নি। বনহুর ওর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে নিষ্পলক চোখে দেখেছিলো কিছুক্ষণ। তারপর সে হামবার্ডের অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করে দ্রুত লিফটে চেপে সরে এসেছিলো বহুদূরে।

ডুবুজাহাজে ফিরে আসার পর হামবার্ডের অস্ত্রাগার বিধ্বস্ত হবার প্রচন্ড শব্দ শুনতে পায় বনহুর। বুকটা একবার কেঁপে উঠেছিলো বনহুরের ঐ মুহূর্তে, কারণ ইলোরার দেহটাও ঐ বিস্ফোরণের শিকার হলো, তার দেহটাও অস্ত্রাগারের বারুদের সঙ্গে মিশে টুকরা টুকরা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়লো।

বনহুর ডুবু জাহাজের সেই স্থানে এসে দাঁড়ালো, যে স্থানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সমস্ত তলদেশ দেখা যায়। ভাবছে বনহুর সামুদ্রিক জীবগুলোও কত সুখী, ওরা মনের আনন্দে গভীর জলরাশির বুকে সাঁতার কেটে ফিরছে।

আজ বনহুর নিজেকে বড় একা নিঃসঙ্গ মনে করছে।

সর্বক্ষণ ইলোরা তার পাশে ছায়ার মত থাকতো। ওর অভাবটা বনহুরকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে তুললো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে পেছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো। তার ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় জ্বলে উঠলো যেন।

[পরবর্তী বই কুচক্রীর কবলে দস্যু বনহুর]

বুকমার্ক করে রাখুন 0

Category: দস্যু বনহুর সমগ্র

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৪ মণিষা দ্বীপের গহ্বরে

পরবর্তী:

৭.১৬ কুচক্রীর কবলে দস্যু বনহুর »